দাদুর দরদ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার অন্যতম পরীক্ষক,

"শয়তানের সুমতি" "মণিমুক্তা" "হীরাজহরত" "কালিদাস"

"বুকের বালাই" প্রভৃতি প্রণেতা—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, এম, এ,

প্রকাশক—শ্রীরমেশচন্দ্র পাল
গুরুচরণ পাবলিশিং হাউস
৯-৩, আরপুলি লেন, কলিকাতা

শ্রাবণ, ১৩৪৪

প্রিণ্টার—জ্যোতির্ম্ময় ভৌমিক
জুবিলী প্রেস
১৪, বৃন্দাবন মল্লিক ফাষ্ট লেন
কলিকাতা

উৎসর্গ

[illegible],

আমার চির আরাধ্য স্বর্গগত পিতামহ

৺চন্দ্রনাথ রায়

ও

স্বর্গগত মাতামহ

৺কিশোরীলাল সরকার

দেবতাযুগলের পবিত্র স্মৃতির

উদ্দেশ্যে—

চিথলিয়া
নদীয়া

ইতি—আশীর্ব্বাদ প্রার্থী
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়

দাদুর দরদী

ক

নাম আমার উৎপল। উপোল, পলা, পালু যাহার যাহা খুশী সে তাহাই বলিয়া এই ভাগ্যহীনকে সম্বোধন করিয়া থাকে। হাঁ, ভাগ্যহীন ভিন্ন আর কি-ই বা বলা যায়? অতি শৈশবেই মাতাপিতাকে হারাইয়াছিলাম। শত চেষ্টাতেও মাতার কোন স্মৃতিই মনে আনিতে পারি না। পিতার সম্বন্ধে বিস্মৃতির অতল গর্ভ হইতে একটি মাত্র ঘটনাই যাহা বারংবার ঊর্দ্ধে উঠিয়া আসে, তাহা পিতার পূজা অর্চ্চনা। অতি প্রত্যূষে তিনি ছাদে উঠিয়া ধ্বান্তারির পূজায় বসিতেন। প্রভাতের বালারুণ ধীরে ধীরে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপাসককে দগ্ধ করিলেও ভক্ত ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। অবশেষে পিতামহ হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করিয়া পিতাকে ছাদ হইতে নামাইয়া আনিতেন। যে দিন নিতান্ত অপারগ হইতেন, সেদিন পিতামহ এই হতভাগ্যকে ছাদে লইয়া যাইয়া রৌদ্রে বসাইয়া দিতেন; তখন পুত্রস্নেহে পূজারীর ধ্যান ভগ্ন হইত। পিতা বলিতেন,—"ওকে আবার এখানে নিয়ে এলেন কেন?"

পিতা বলিতেন—"ওকে আবার এখানে নিয়ে এলেন কেন?" (১ পৃঃ)

পিতামহ হাসিয়া উত্তর দিতেন,—"এই মা-মরা ছেলেটির গায়ে রোদ লাগ্‌লে যেমন তোমার কষ্টের সীমা থাকে না বাবা, তেমনি মা-মরা আমার ছেলেটির পিতারও তার পুত্রের জন্য কষ্ট তো কম হয় না বাপু!"

পিতা তখন নিরুপায় হইয়া নামিয়া আসিতেন। কিন্তু তাহার পরে পিতামহ যখন "দুধের চেয়ে সর মিষ্টি" অর্থাৎ পুত্র অপেক্ষা পৌত্রের প্রতিই মানুষের স্নেহের টান অধিক এই বাক্যটির যাথার্থ্য প্রমাণ করিতে বসিতেন তখন উল্লিখিত গল্পটির সাহায্যে তাঁহাকে নিরস্ত করিতাম, সেই হেতুই বোধহয় কথাটি মনের মধ্যে গাঁথিয়া গিয়াছিল; নতুবা অতি শৈশবের অনেক কথাই তো আজ ভুলিয়া গিয়াছি, আর এই প্রকারের দুই চারিটি কথাই বা কেন তবে এতদিনও মনে আছে?

সে যাহা হউক জনক জননীর মৃত্যুর পর, পিতামহ ও মাতামহের স্নেহেই এত বড় হইয়াছি। তাঁহাদিগের সুগভীর, অজস্র ভালবাসা একদিনের নিমিত্তও আমাকে মাতাপিতার অভাব, এতটুকুও বুঝিতে দেয় নাই। আমাকে মানুষ করিবার জন্য পিতামহের সে কি ঐকান্তিক আগ্রহ! আমার প্রশংসা শুনিলে মাতামহেরও সে কি আনন্দ!

আমার জীবনের অধিকাংশ সময়ই দুই বৃদ্ধের সাহচর্য্যেই অতিবাহিত হইয়াছে, তাই আমি আমার সমবয়সীর দলে সব সময় ঠিকমত মিশিতে পারি না। অনেকে অনেক সময়েই "শিশু প্রাজ্ঞ" বলিয়া আমাকে বিদ্রূপ করে। তাহাও ভাল!

শয়তানের অপেক্ষা প্রাজ্ঞ হওয়া কি মন্দ? এ জগতে প্রাজ্ঞ হওয়া ভিন্ন কোন গত্যন্তর নাই।

আমাদের গ্রামে একটি পাঠশালা আছে। প্রাথমিক লেখাপড়া শিখিবার সামান্য ব্যবস্থা থাকিলেও পিতামহ মহাশয় তাঁহার একমাত্র স্নেহের ধনকে যে কেন অত সহজে কলিকাতায় তাহার মাতামহের নিকট পাঠাইয়াছিলেন তাহার একটু কারণ আছে।

আমি একটু অধিক বয়সেই লিখিতে ও পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। প্রথমে গৃহেই পিতামহ মুখে মুখে নিজেই কত শ্লোক, স্তব প্রভৃতি মুখস্থ করাইয়া, এই ভূতকে মানুষ করিবার জন্য শেষে গ্রামের পূর্ব্বোক্ত পাঠশালায় পাঠাইয়াছিলেন। সেখানে আমি মাত্র একদিন গিয়াছিলাম। সেখানকার অভিজ্ঞতা আমার অধিক নাই। তথাপি প্রথমদিন পাঠশালায় যাইয়া আমি যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা আজও কিন্তু বেশ সুস্পষ্ট মনে আছে।

ঠাকুরদাদা আমাকে পাঠশালায় রাখিয়া চলিয়া গেলেন। মনটা বড়ই কেমন করিতে লাগিল। আমি যেন 'বাঁশ বনে ডোম কানা' গোছের হইয়া গিয়াছিলাম। চারিদিকে কত প্রকার ছাত্র, বিচিত্র সুর ও অপূর্ব্ব ধ্বনি সহকারে পাঠাভ্যাসের নামে হট্টগোল জুড়িয়া দিয়াছে। নাকে চশমা আঁটিয়া বেত্র হস্তে পণ্ডিত মহাশয় বসিয়া আছেন। মাঝে মাঝে ইহাকে উহাকে ডাকিয়া পড়া জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদিগের প্রতি

যথাযোগ্য ব্যবহার করিতেছেন। আমি অতি মনোযোগের সহিত এই সব দেখিতেছি ও শুনিতেছি। সমস্ত ব্যাপারটা যেন এক বিরক্তিকর মহাবিস্ময়ের বস্তু বলিয়াই আমার মনে হইতেছিল।

এই সময়ে পণ্ডিতমহাশয় রঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই রঙ্গা, এইদিকে আয়! কড়াকিয়ার পড়া দিবি।"

রঙ্গা আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বল্ দশ কড়া কত?"

রঙ্গা চট্‌পট্ উত্তর দিল,—"আড়াই গণ্ডা।"

পুনরায় প্রশ্ন হইল,—"একত্রিশ কড়া?"

"......গণ্ডা।"

"পঞ্চান্ন কড়া?"

"......গণ্ডা।"

"বিরাশি কড়া?"

"......গণ্ডা।"

"সাতানব্বই কড়া?"

"......গণ্ডা।"

অর্থাৎ রঙ্গা উত্তর যে কি দিল তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম না হইলেও পণ্ডিত মহাশয়ের মুখ হইতে প্রশ্ন বাহির হইতে না হইতেই এমন চট্‌পট্ সে 'গণ্ডা গণ্ডা' করিয়া যাইতে লাগিল যেন সমস্তই তার নখদর্পণে। শ্রোতার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহই উপস্থিত হইল না যে তাহার উত্তর সঠিক হইল কিনা

তিনি ভাল করিয়া শুনিয়া যাচাই করিয়া দেখেন ; বরঞ্চ পণ্ডিত মহাশয় অতিশয় পুলকিত হইয়া বলিলেন,—"বেশ বাবা, বেশ ! এই তো চাই। বেঁচে থাক্‌লে ও আমার নাম রাখ্‌বে।"

তাহা রাখিবে। রঞ্জা যাইয়া আপন স্থানে উপবেশন করিয়া শ্লেটের আড়ালে পণ্ডিত মহাশয়কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

নিধুর ডাক পড়িল,—"নিধে হতভাগা, ইদিকে আয় ! বলি পড়া করেছিস্ ?"

চোখ দুইটি পিট্‌পিট করিতে করিতে নিধু উত্তর দিল,—"এজ্ঞে হিঁ পণ্ডিত মশাই !"

"হিঁ পণ্ডিত মশাই, আচ্ছা দেখি কেমন হিঁ পণ্ডিত মশাই ! বল,—সলিল মানে কি ?"

"বানান বলি পণ্ডিত'শাই ?"

মশাই ভেঙ্‌চাইয়া উঠিলেন,—'বানান বলি মশাই ? সলিল বানান করা তো ভারী 'ইয়ে' কিনা তাই বানান করি মশাই ? যা' ব'ল্‌ছি তাই কর—মানে বল।"

নিধু বলিল,—"মানে ? পণ্ডিত'শাই, মানে ? সলিল মানে ?"

"আরে হাঁ হাঁ মানে, সলিল মানে ?"

"মানে ?—মানে ?—সলিল মানে ? সলিল মানে পণ্ডিত'শাই ?"

"আরে গাধা হাঁ ! হাঁ !"

"মধ্যাহ্ন ষ, স্বারে অ—"

গর্জ্জন উঠিল,—"চুপ্! মধ্যাহ্ন ষ অপরাহ্ন ষ কে তোকে বানান ক'রতে ব'ল্ছে রে হতভাগা, শুয়োর!"

"তবে কি মানে ব'লবো পণ্ডিত'শাই?"

"হাঁ, হাঁ, দয়া ক'রে তাই বলুন।"

"সলিল মানে? সলিল মানে পণ্ডিত'শাই? সলিল মানে?"—নিধু মাথা চুল্‌কাইতে লাগিল।

নিধুর অবস্থা ক্রমশঃ সঙ্গিন হইয়া উঠিতেছে; এখনই সপাসপ্ বেত্রাঘাতে তাহার পৃষ্ঠদেশ যে পরম পুলকিত হইয়া উঠিবে, পণ্ডিত মহাশয়ের সগর্জ্জন বেত্রাস্ফালনেই তাহার সুমধুর পূর্ব্বাভাষ প্রাপ্ত হইতেছি। তাহার সেই দিব্য অবস্থা কল্পনা করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না।

পাঠশালার অদূরে শস্যক্ষেত্র এবং তাহার পার্শ্ব দিয়া স্বচ্ছ সলিলা নদী কলু কুলু রবে প্রবাহিতা। সেই নদীর জলরাশির দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিলাম।

"সলিল মানে? পণ্ডিত'শাই, সলিল মানে?"

বেত্রের সুমধুর শব্দ শ্রুত হইল,—"সপাং!"

সঙ্গে সঙ্গে নিধু বলিল,—"সলিল মানে পণ্ডিত'শাই, —অর্চ্চ।'

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—"স্বচ্ছ, স্বচ্ছ কি?"

নিধু সংশোধন বরিয়া বলিল,—"স্বচ্ছ নয় পণ্ডিত'শাই, —অর্চ্চ, অর্চ্চ—ঘোলা।"

পণ্ডিত মশাই আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—"অর্চ্চ কিনা ঘোলা। অর্থাৎ? ও! অশ্ব কিনা ঘোড়া, ওরে হতভাগা সলিল মানে—ঘোড়া!"

অতঃপর নিধুর ভাগ্যে যাহা ঘটিল তাহা খুলিয়া না বলিলেও বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হইবার তো কথা নহে! কিন্তু ভাবিতেছি সলিল মানে ও অশ্ব বলিল কেন?.

সহসা অদূরে দৃষ্টি পড়িল; দেখিলাম—নদী তীরস্থ শস্য ক্ষেত্রে একটী ঘোটক মনের আনন্দে কৃষকের পুণ্য সঞ্চয়ের সহায়তা করিতেছে।

হায় ভগবান! আমি নদীর জলের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া সলিলের অর্থ বুঝাইতে চাহিয়াছিলাম কিন্তু নিধু তাহা বুঝিতে না পারিয়া ভাবিয়াছিল যে আমি ওই অশ্বের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছি। তাই তাহার এই দুর্দ্দশা! আহারে!

এই সময় হাঁদা চীৎকার করিয়া উঠিল,—"পণ্ডিত'শাই, কদম আপনাকে বেত মারছে।" .

"কিরূপ? আমাকে বেত মারলে অথচ আমিই জানতে পারলুম না!"—পণ্ডিত মহাশয়ের চক্ষুযুগল বোধহয় ইহা ভাবিয়াই বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

কদম তাহার নিজের সৃষ্ট চিত্রকলার প্রতি মায়া বশতঃ তাহা মুছিয়া ফেলিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল।

হাঁদা সচীৎকারে—"হিঁ পণ্ডিত'শাই, সত্যি!" বলিয়াই

ছোঁ মারিয়া কদমের হাত হইতে তাহার শ্লেটখানি কাড়িয়া লইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

সত্যই কদমের দ্বারা শ্লেটের উপর এক অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। চিত্রটির বিষয় বস্তু হইতেছে এই—পণ্ডিত মহাশয় যেন তাঁহার পদমর্য্যাদা হারাইয়া নিধুর স্থান অধিকার করিয়া জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। আর নিধু যেন পণ্ডিত মহাশয় সাজিয়া বেত্র আস্ফালন করিতেছে। চিত্রটিতে 'পণ্ডিতমশাই' ও 'নিধুর' আকৃতিগত বিশেষ মিল না থাকিলেও কদমের বিবেচনায় ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্য উহাতে যথেষ্টই সফল হইয়াছে।

পণ্ডিত মহাশয়ের বিবেচনায় যখন স্থির হইল যে তাঁহার হস্তের সুপুষ্ট বেত্রখানি যতক্ষণ ভগ্ন না হয় ততক্ষণ উহা কদমের পৃষ্ঠে অনবরত পুষ্পবৃষ্টি করিতে থাকিবে তখন কদম আপন রসিকতায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। পুষ্পবর্ষণের ভার আবার পড়িল নিধুরই হস্তে।

কদম সহসা 'মরিয়া' হইয়া উঠিয়া নিধুর হস্ত হইতে বেত্র কাড়িয়া লইয়া, ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা করিয়া একলম্ফে পাঠশালা গৃহের বাহিরে আসিয়া 'চ্যালেঞ্জ' করিতে লাগিল—"যুদ্ধং দেহি।"

দেহি তো বটে, কিন্তু দিতে কে অগ্রসর হয়? এ উহার মুখের শোভা অবলোকন করে! সকলের বক্ষই স্পন্দিত হয়।

পণ্ডিত মহাশয় ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়া-

ছিলেন। তাঁহার এই সুদীর্ঘ কার্য্যকালে এইরূপ বিসদৃশ ব্যাপার ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও তিনি অনুষ্ঠিত হইতে দেখেন নাই, তাই তাঁহার বিস্ময়ের সীমা একটু অতিমাত্রায় অতিক্রম করিয়াছিল। উক্ত অবস্থার ঘোর একটুখানি কাটিতেই তিনি একটি বিরাট হুঙ্কার পরিত্যাগ করিলেন—"এই হাঁদা, সেধো, মোদো, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি ? ধর ইষ্টুপিট্‌কে। কান পাকড়কে উল্লুককে এখানে ধ'রে নিয়ে আয় !"

সুতরাং না যাইয়া উপায় কি ? হাঁদা, সেধো, মোদো প্রভৃতি সভয়ে অগ্রসর হইল।

কদম সন্নিকটে ইট পাট্‌কেল প্রভৃতি যাহা পাইল তাহাই হাত দিয়া বেপরোয়া ছুঁড়িতে ও মুখে সঙ্গে সঙ্গে এক অপূর্ব্ব কবিতা আওড়াইতে লাগিল,—

"মশাই বড় শক্ত,
ভয়ে ঢোকে গর্ত্ত,
গর্ত্তের ভেতর গোসাপ,
মশাই বলেন,—'বাপ্‌রে বাপ্ !"

পণ্ডিত মহাশয় ক্রোধে অধীর হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন,—"তোকে ধ'রতে পারলে হাড় এক জায়গায় মাস আর জায়গায় ক'রবো রে হতভাগা ! মার খেতে চাস্ তো এগিয়ে আয় ব'লছি হতভাগা, পাজি, নচ্ছার কোথাকার।"

পাজি কিন্তু 'এই আসছি' বলিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি কদলী প্রদর্শন করিয়া পরিপাটী চম্পট দিল। হাঁদা, মোদো

প্রভৃতি তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াও তাহাকে ধরিতে পারিল না বা ধরিতে সাহস করিল না।

কদম সেই যে গেল আর কখনও পাঠশালায় পুনরায় প্রবেশ করিল না।

না করুক! কিন্তু আমাকে যে তাহার দল বিষম ফ্যাঁসাদে ফেলিল দেখিতেছি।

"কেন?"—বলিতেছি।

কদমপ্রমুখ বালকের দলের, আমার প্রতি প্রকাণ্ড এক অভিযোগ এই যে আমিই নাকি ইঙ্গিতে সলিলের কদর্থ বলিয়া দিয়া নিধুকে প্রহার খাওয়াইয়াছি এবং নিধুর প্রতি প্রহারের প্রতিশোধ লইতেই তো কদম, পণ্ডিত মহাশয়ের সেই ব্যঙ্গচিত্র আঁকিয়াছিল এবং তাহার ফলেই না তাহাকে পাঠশালা চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিতে হইল। তবে?

আমি ভাবিলাম—"হায় রে কপাল!"

কিন্তু যাহাই ভাবি না কেন, অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করিতেই হইবে।

তাহাদিগের ভিতর নানারূপ প্রায়শ্চিত্তের ফর্দ্দ প্রস্তুত হইল ও অবশেষে একটিমাত্র যাহা ধোপে টিকিল তাহা হইতেছে এই যে তাহারা 'চড়াইভাতি' করিবে। মৎস্য ব্যতীত আর সমস্ত খরচই আমাকে বহন করিতে হইবে। মৎস্যের জন্য অবশ্য কোন চিন্তাই নাই, কেন না তাহা তাহারা 'রিচু' অর্থাৎ মালিকের নিকট হইতে না বলিয়া চাহিয়া লইবে। এমন

তাহারা অনেকবারই লইয়াছে। অতএব সে বিষয়ে 'চিন্ত্রা'র কোনই কারণ নাই।

এই নাবলিয়া চাহিয়া লওয়া ব্যাপারটা যে কি তাহা জানিবার কৌতূহল পাঠকের অবশ্যই হইতে পারে তাই সেই কৌতূহল ভঞ্জনের নিমিত্ত এখানে বিষয়টি একটু পরিষ্কার করা আবশ্যক।

পল্লীগ্রামে অনেকে বাঁশ ও দড়ির সাহায্যে মৎস্য ধরিবার নানাপ্রকার 'ফাঁদ' প্রস্তুত করিয়া নদীর দুইধারে পাতিয়া রাখে। এমন কি ছোট বড় নৌকা প্রভৃতিও ডালপালায় বোঝাই করিয়া নদী গর্ভে ডুবাইয়া রাখে। সেই সব ফাঁদ প্রভৃতিতে মাছ ঢুকিয়া আর বাহির হইতে পারে না। ফাঁদ বা নৌকার অধিকারীবৃন্দ প্রত্যূষে আসিয়া আপন আপন ফাঁদ প্রভৃতি তুলিয়া তাহা হইতে মৎস্য সংগ্রহ করিয়া পরের দিনের আশায় পুনরায় উহা নদীর জলে ডুবাইয়া রাখিয়া যায়।

—পল্লীর দুষ্ট বালকগণ সময়ে সময়ে দল বাঁধিয়া আসিয়া সেই সমস্ত ফাঁদ তুলিয়া রাত্রেই মৎস্য সংগ্রহ ক'রে, প্রভাতের অপেক্ষা করে না। তাহাতে মৎস্য আশানুরূপ পাওয়া না যাইলেও, ওই যাহাকে বলে 'রাই কুড়িয়ে বেল' তাহা হয়। কথায় বলে 'দশের লাঠি একের বোঝা'

কদমের দলও সেইরূপে বেল বা লাঠি সংগ্রহ করিবে। এবং সেই দলে আমাকেও যোগদান করিতে হইবে, নতুবা আমার ঠ্যাং ভাঙ্গিয়া দিবে। কোনরূপেই আর 'বাঁচোয়া' নাই।

কিন্তু উক্ত মহৎ কার্য্য রাত্র একটু অধিক না হইলে তো নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইবার নহে। অতএব আমি কি করিয়া এই কার্য্যে যোগদান করিব ? ঠাকুরদাদা রাত্রে আমাকে ছাড়িয়া দিবেন কেন ? তাহা তাহারা কিছুতেই বুঝিবে না।

কদম দাঁত মুখ খিঁচাইয়া উঠিল,—"উঃ! কি আমার ভাল ছেলেরে ! ঠাকুরদাদার আঁচলধরা ! আমরা আস্‌তে পার্‌ব, আর উনি পারবেন্ না। আস্‌তে তোকে হ'বেই, আর সেই সাথে, অন্যান্য খরচও তোকে দিতে হ'বে। নইলে চিনিস্ তো কদম কে ?—আচ্ছা এখন যা ! ঠিক থাকিস্।"

তারপর একটুখানি ভাবিয়া আবার বলিল,—"সন্ধ্যার সময় গাড়ু হাতে বাইরে আসিস্। আমি কাছেই থাক্‌বো, সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌বোখন।"

অবশেষে নিধু, রঞ্জা প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া সে বলিল,— "তোরা সব তৈরি হ'য়ে নদীর ধারের বটগাছের তলায় এসে সব আমাদের জন্য 'অপিক্ষে' ক'রবি, বুঝলি ? তারপর আমরা দু'জনে এসে জুটবো। আচ্ছা এখন সব যা'। আমার আবার পূব পাড়ায় একটু কাজ আছে একটু ঘুরে আসি" বলিয়াই সে চলিয়া গেল। তখন আর সকলেও যে যাহার মত সরিয়া পড়িল।

আপাততঃ রেহাই পাইলাম বটে কিন্তু তারপর ? ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী আসিলাম। গৃহে ফিরিয়াও ভাবনার সীমা রহিল না।

ঠাকুরদাদা যে কখন হইতে আমাকে লক্ষ্য করিতেছেন তাহা চিন্তা সাগরে ডুবিয়া আমি বিন্দুমাত্রও টের পাই নাই। তিনি নিকটে আসিয়া, সস্নেহে আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—"মুখটা অত শুক্‌নো কেন ভাই? এতো কি ভাবছিস্ বল্‌তো?"

যে কার্য্য কিছুতেই হয়তঃ সম্ভব হইত না; তাহা স্নেহপূর্ণ একটুখানি মিষ্টবাক্যে সম্ভব হইয়া গেল। আমি পিতামহের আদরপূর্ণ বাক্যে কাঁদিয়া ফেলিয়া সমস্ত খুলিয়াই বলিলাম।

তিনি বলিলেন,—"যাক আর তোকে পাঠশালে যেতে হ'বে না। তোকে শীগ্‌গীরই ক'লকাতায় তোর দাদা মশাইয়ের কাছে পাঠাব। সেখানেই প'ড়বি। সেই বেশ ভাল হ'বে—কেমন?"

খ

দাদামহাশয় শেষ জীবনে কলিকাতায় গঙ্গাতীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মামারা কেহ বা আফিসে চাকুরী করিতেন, কেহ বা কলেজে পড়িতেন ; আর দাদামহাশয় আজ কালীঘাট কাল দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় প্রভৃতি ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং বাসায় ফিরিয়া কখনও বা ধর্ম্মগন্থ, কখনও বা আমাকে লইয়া বসিতেন।

দিদিমা অনেকদিন পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার অনাবিল, স্নিগ্ধ, মধুর স্বর্গীয় স্নেহ ভোগ করিবার সুদীর্ঘ অধিকার ভগবান না দিলেও যে স্বল্প সময়ও সে অধিকার পাইয়াছিলাম তাহাতেই স্মৃতির মণিমঞ্জুষার একটি দীর্ঘ স্থানে তাঁহার কথা অক্ষয় উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে। দিদিমার সেই পুণ্যস্মৃতি কখনই নিষ্প্রভ হইবার নহে।

বলিতে হয় বলিয়া বলিতেছি না,—আমার বিশ্বাস দিদিমা যদি রাণী-মহারাণী হইতেন তবে তাঁহার সততা ও দানশীলতার কথা 'প্রভাতবাক্যে'র মত ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িত। নিজের মুখের গ্রাস ভিখারীকে তুলিয়া দিয়া তাঁহাকে প্রায় নিত্য উপবাসী থাকিতে দেখিয়াছি। দারুণ শীতে লেপ, আলোয়ান প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার শীত বস্ত্র গরীব দুঃখীকে দান করিয়া তাঁহাকে 'হিহি' করিয়া শীত কাটাইতে দেখিয়াছি। তাঁহার অবস্থা দর্শনে পুনরায় তাহাকে লেপ তোষক প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়া

দেওয়া হইয়াছে। দুই চারিদিন অতীত হইতে না হইতেই তাহাও তিনি "যথা পূর্ব্বং তথা পরম" করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহাতেই তাঁহার সুখ, তাহাতেই তাঁহার শান্তি! কিন্তু প্রার্থী বিফল মনোরথ হইলে তাঁহার দুঃখ কষ্টের অবধি থাকিত না। তাই তাঁহার স্বামীপুত্র তাঁহাকে খুশী করবার জন্য তাঁহাদিগের অবস্থার অতিরিক্ত অর্থ তাঁহাকে ব্যয়ের জন্য প্রদান করিতেন কিন্তু দুইদিন পরেই তাঁহার হস্তে একটি কপর্দ্দকও থাকিত না—সমস্ত নর-নারায়ণের জন্য খরচ করিয়া ফেলিতেন।

বৈকুণ্ঠের নারায়ণের জন্যও তাঁহার মস্তিষ্কের বেদনা কিছু অল্প ছিল না। ধর্ম্মের জন্য কত কৃচ্ছ্রসাধনই না তাঁহাকে করিতে দেখিয়াছি। এমন পরদুঃখকাতরা, স্নেহময়ী, ভক্তিমতি, দানশীলা মহিলা নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়াছেন। তিনি যদি স্বর্গের উচ্চস্তরে স্থান না পাইয়া থাকেন তবে তথায় কাহারা স্থান লাভ করিয়া থাকেন জানি না। এই মরজগতে যেমন মিথ্যা, অসাধুতা প্রভৃতিই অধিকাংশস্থলে উচ্চস্থান লাভ করে, সেখানেও কি তাহাই? সেখানেও কি কেবল সিন্দুকের উচ্চতাই মানুষের উচ্চতার মাপ কাঠি—হৃদয়রূপ বালাইয়ের সেখানেও কি কোন মূল্য নাই? "হরি সে দেখে হৃদয়খানি ভোলে না দেখি গেরুয়াবাস।"—এ কথা কি মিথ্যা? যাক্ সে কথা, এখন আমার কথা শেষ করি। আমি কলিকাতায় থাকিয়া পাঠাভ্যাস করি ও স্কুলের ছুটি হইলে গ্রামে ঠাকুরদাদার কোলে ফিরিয়া যাই।

একবার পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছি। সংবাদ পাইবামাত্র সুমন্ত্র আসিয়া জুটিল। কলিকাতার 'যাতুঘর' 'চিড়িয়াখানা' প্রভৃতির সম্বন্ধে নানাকথা বলিয়াই তাহাকে তাক্ লাগাইয়া দিলাম। যদিও সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি তথাপি এখনকার মত তত প্রগতি তখনও হয় নাই, তাই থিয়েটার বায়োস্কোপে তখনও ডবল প্রমোশান পাই নাই। অতএব কলের জল, দশ-আনা ছ'আনা কেশের বাহার প্রভৃতির পুঁজি লইয়াই পাড়ি জমাইতে অর্থাৎ কিনা নিজেকে জাহির করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলাম।

সুমন্ত্রও ছাড়িবার পাত্র নহে, সে আমাকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া গিয়া যাহা বলিল তাহাতে আমিও অতি মাত্রায় বিস্মিত না হইয়া পারিলাম না। সে যে কথা বলিয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া আজ তাহাদিগকে কৃপার পাত্র মনে হইলেও তখন কিন্তু ভাবিয়াছিলাম,—সুমন্ত্ররা না জানি আহা কতই ভাগ্যবান! যে উন্নতি আমি ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহর কলিকাতায় থাকিয়াও করিতে পারি নাই হাঁদা, সুমন্ত্র প্রভৃতি এই অধম পল্লীগ্রামে থাকিয়াও কেমন পরিপাটিরূপে তাহা সমাধা করিয়াছে। সত্যই তাহাদিগের নিকট আপনাকে অত্যন্ত নিষ্প্রভ বলিয়াই মনে করিতে লাগিলাম।

কানের কাছে মুখ লইয়া আসিয়া সুমন্ত্র ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল,—"যাবি ভাই পালু, আমাদের পূজোর থানে?"

আমি বলিলাম,—"পূজোর স্থান? সে আবার কি? কোথায়? তোরা আবার কি পূজো করিস্?"

"সেও একরকম পূজোই বটে! তবে এখনও আমরা 'রীতিরকম' বাবার মহাপূজো ক'রতে শিখিনি বটে; কিন্তু শিগ্‌গীরই যে—"

"বাবার পূজো মানে?"

"আরে হাঁরে হাঁ! বাবা 'তুরুষ্টু' হন বড় তামাকে তাও জানিস্ নি? ক'লকাতায় থেকে থেকে যে তুই একটা আস্ত ভূত হয়েছিস্ রে, আশ্চয্যি!"

আমি কিছুই বলিলাম না, কি আর বলিব? সুমন্ত্র পুনরায় বলিতে লাগিল,—"আমরা অবিশ্যি ছোট তামাকেই 'তেনার' পূজো সারি। ভোলা মাটি দিয়ে এমন খাসা হুঁকোর খোল 'বেনিয়েছে' যে সে তোকে আর কি ব'ল্‌ব। দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারবি। সেই হুঁকোর আগায় 'সিক্রেট' ধরিয়ে যখন আমরা টানি হুঁকো তখন আহ্লাদে খুড়ো, খুড়ো ডাক ছাড়েন। ভেতরে জল থাকেন কিনা, না ডেকে কি আর পারেন? কদম তখন 'হর হর মহাদেও' ব'লে নেত্য করে। সে যে কি মজা! হাঃ! হাঃ! হাঃ!"

"মাটির খোল জলে গ'লে যায় না রে?"

সে সপ্রতিভ ভাবে বলিল,—"ধেৎ! তা' যাবেন কেন? তেনারে যে পুড়িয়ে শোধন করা হয়েছেন রে! তার ওপরে আবার কত 'চিরিত্তির' করা হয়েছেন। কদম বড় হ'লে

বাস্তবিক একটা 'রোস্তাদ' ছবিওয়ালা হ'বে, তা' তুই দেখে নিস্।"

কদমের চিত্রকলার পরিচয় পূর্ব্বেও একবার পাইয়াছিলাম, তাই বলিলাম,—"আমি তা' জানি, তারপর তুই যখন ব'লছিস্ তখন না দেখেই বুঝতে পারছি যে সে একজন মহা ওস্তাদ হ'বেই।"

সুমন্ত্র বলিল,—"আচ্ছা তৈরি থাকিস্। দুপুর বেলায় আমি এসে তোকে নিয়ে যাব'খন—কেমন ?

কিন্তু শুনিয়াছিলাম,—

ঠিক 'দুপ্পুর' বেলা,
ভূতে মারে ঢেলা।"

তাই একটু ভীত হইয়া সেই কথার উল্লেখ করিলে সুমন্ত্র বলিল,—"আরে ধ্যেৎ ! ভূত আবার কি ?

"ভূত আমার পুত্, পেত্নী
আমার ঝি,
রাম লক্ষ্মণ সাথে আছেন
ক'রবি আমার কি ?"

আর ভূত তো আমরাই রে ! ভূত আবার আছেন নাকি ? সেদিন আমি আর কদম যা' মজাটাই করেছিলুম তা' শুন্‌লে হেসে তুই বাঁচবি নি। সেদিন মাধবতলার হাটবার। হাটের ফেরত লোকজন সব রাত্তিরে যখন গ্রামে ফিরছে তখন রক্ষে-কালী তলায় যে প্রকাণ্ড বটগাছটা আছে না ? তা'র উপরে

চ'ড়ে ব'সে আছি,—আমরা দুই মাণিক জোড়! সম্বলের ভিতর 'সিক্রেটের' আগুন, আর পরণের শাদা কাপড়। ডালপালার আড়ালে লুকিয়ে তাই দিয়েই অতগুলো লোককে দু'জনে যা' নাকাল করেছিলুম, তা' কি আর ব'ল্‌বো। সে না হয় আর একদিন শুনিস্‌। আজ বেলা হ'য়ে গেছে—থাক্‌! মোদ্দা তুই তৈরি থাকিস্‌—কেমন?"

"আচ্ছা।"

সুমন্ত্র চলিয়া গেল।

গ

দ্বিপ্রহরে আহারাদি শেষ হইলে আমি ও ঠাকুরদাদা যাইয়া বৈঠকখানায় বসিলাম। গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দাদু আমাকে আদর করিয়া বলিলেন,—"উৎপল, কবে তুই বড় হ'বি ভাই, তোকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিয়ে আমি ছুটি পা'ব!"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"কিসের ছুটি দাদু? তুমি তো আর স্কুলে পড় না যে ছুটি পাবে!"

দাদু তাঁহার চক্ষু দুইটি অসম্ভব রকম বৃহৎ করিয়া বলিলেন,—"পড়িনি কি রকম? চুল পাক্‌লো তবে কি এমনি?

"চুল পাক্‌লেই বুঝি সে খুব পণ্ডিত হয় দাদু! তা' হ'লে তো—"

"যা' ব'ল্‌বি বুঝেছি। এই সংসারের পাঠশালায় মানুষকে যে মৃত্যুকাল অবধি শিখ্‌তে হয়—নইলে কি আর ছাড়াছাড়ি আছে রে গাধা! পণ্ডিতগণ অজ্ঞানতাকে অন্ধকারের সাথেই তুলনা দিয়ে থাকেন। তাই মানুষের মূর্খতা যতই স'রে যেতে থাকে ততই তার চুলের কাল রং ধোপে ধোপে শাদা হ'য়ে ওঠে। তখন তিনি হ'ন জ্ঞানবান। জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর বর্ণ তাই শাদা! তা' জানিস্ গাধা!"

গাধা তখন উতলা হইয়া উঠিয়াছে। কখন সুমন্ত্র আসিয়া না জানি ডাক দেয়!

গাধা বলিল,—"আচ্ছা দাদু, তুমি তাকিয়াটা মাথায় দিয়ে একটু শুয়ে পড়, আমি তোমার পাকা চুল তুলে দি।"

দাদু হাসিয়া বলিলেন,—"কেন আমার বিজ্ঞতার নিশানগুলি বুঝি তোর আর চোখে সইছে না?"

আমি বলিলাম,—তবে পায়েই হাত বুলিয়ে দি—কেমন?"

দাদু যেন কেমন এক প্রকার করুণ স্বরে বলিলেন,—"দিবি? আচ্ছা দে! ভাগ্যে যেটুকু আছে তা' ছাড়ি কেন?"

একটু পরেই দাদু ঘুমাইয়া পড়িলেন এবং তাহারও কিছু পরে অদূরে একটা শিসের তীব্র শব্দ শ্রুত হইল।

বদনবিবরে অঙ্গুলির সাহায্যে, সুমন্ত্র একপ্রকার তীব্র ধ্বনি নির্গত করিতে পারে। ও আমার পরিচিত শব্দ! সুমন্ত্র আসিয়াছে তবে!

আমি আস্তে আস্তে পা টিপিয়া বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম—ফটকের সম্মুখে বকুল বৃক্ষের তলদেশে সুমন্ত্র দাঁড়াইয়া আছে। তাহার নিকট যাইতেই সে বিনাবাক্য ব্যয়ে আমার একটি হস্ত আকর্ষণ করিয়াই দিল—ভোঁ দৌড়।

দৌড়াইতে দৌড়াইতে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কোথায় যেতে হ'বে?"

সে বলিল,—"পূজার থানে।"

ঘ

পূজার স্থানটি কিন্তু সত্যই চমৎকার! গ্রামের প্রান্ত দিয়া যে নদীটি বহিয়া যাইতেছে তাহারই তীরে অনেকদিনের প্রাচীন একটি কালীমন্দির! কালীমন্দিরের পশ্চাতে খানিকটা স্থান, গাছে আগাছায় পরিপূর্ণ নাতিক্ষুদ্র একটি ঝোপ্! ঝোপের ভিতর হইতে দুই চারিটি বিরাট বৃক্ষও ঊর্দ্ধে মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান। চতুর্দ্দিকে স্বচ্ছন্দজাত নানা-প্রকার কণ্টকবৃক্ষের অজস্র সমাবেশে ঝোপটির ভিতর প্রবেশ করা এক অসাধ্য ব্যাপার—ইহাই সকলে জানিত, কিন্তু সেই অসাধ্য ব্যাপারও সুমন্ত্রের দল সুসাধ্য করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা উক্ত ঝোপের ভিতরই তাহাদিগের পূজার স্থান মনোনীত করিয়াছিল, কারণ উক্তস্থানে বসিয়া পূজা করিলে কিছুতেই পূজায় ব্যাঘাত ঘটিবার আশঙ্কা নাই; কারণ বাহির হইতে ভিতরে দেখিতে পায় এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আজও ভগবান বোধহয় সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। যাহা হউক সেই স্থানে বসিয়াই সুমন্ত্রেরা ছোট তামাকেই দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকে। বড় তামাকে তাহারা তখনও প্রমোশান পায় নাই কিন্তু পূজায় তাহাদের যেরূপ ঐকান্তিক নিষ্ঠা তাহাতে যে শীঘ্রই তাহারা উহাতেও উন্নীত হইবে এরূপ ভরসা করিলে অন্যায় হইবে না।

আমি তাহাদিগের সম্মানীয় অতিথি! সুতরাং বাবার 'ভোগ নিবেদন' সমাধা হইলে সেদিন আমিই সর্ব্বপ্রথম প্রসাদ পাইবার অধিকারী নির্ব্বাচিত হইলাম। প্রসাদ গ্রহণ করিতে যাইয়া কিন্তু উঃ! সে কি ভীষণ কাশি আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বিবমিষায় সর্ব্বাঙ্গ কুঞ্চিত হইতে লাগিল। অন্নপ্রাশনের অন্নও বুঝি বাহির হইয়া আসিল। বন্ধুরা কেহ ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল; কেহ বা নূতন বলিয়া আমার প্রতি একটু সহানুভূতিও দেখাইল।

সুমন্ত্র বলিল,—"বাবার সেবা কি আর অত সোজা রে যে একবারেই হ'বেন? পেথ্থম পেথ্থম এক আধটু অমন হবেনই, তারপর সব ঠিক হ'য়ে যাবেন!"

কদম বেদম হাসিতে লাগিল,—"ধ্যেৎ! ধ্যেৎ! একেবারে আনাড়ি! 'এট্টু আধটু' পেথমে সকলেরই হয়, তাই ব'লে ওই রকম? আনাড়ি! আনাড়ি! একেবারেই আনাড়ি ওর দ্বারা কিচ্ছু হ'বে না।"

"কি-ই-ঈ আনাড়ি! সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি আর আমাকে দিয়ে কিচ্ছু হ'বে না!"

একে তখন ষোল বৎসর বয়স, তাহাতে কলিকাতায় পড়ি। ক্ষুদ্র পল্লীর কয়েকটা বালক আমাকে বলিবে—"আনাড়ি।"

আত্মাভিমানে অতিশয় আঘাত লাগিল। লাগিবে না? কি অপমানের কথা? মনে হইল পৃথিবী যদি দ্বিধা হইতেন, আমি তাহা হইলে সীতার মত তাঁহার ভিতরে প্রবেশ করিতাম।

পৃথিবী কিন্তু দ্বিধা হইলেন না, আমারও পাতালে প্রবেশ করা হইল না। তাহা হইলে কে আজ ইহা লিখিত ?

সুমন্ত্র বলিল,—"দেখ এক কাজ করিস্! তোর ঠাকুর্দ্দা তো গয়া, কাশী বিষ্ণুপুরের ভাল ভাল তামাক খান। সে তো এই 'দা-কাটা' তামাকের মত এতকড়া নয় ; তোর ঠাকুর্দ্দা গাঁয়ের ভেতর কোথাও গেলে তাই চুপি চুপি সেবা ক'রে মাঝে মাঝে 'আব্যেস' করিস্ বুঝ্‌লি ?"

কথা বলিবার শক্তি ছিল না তাই সম্মতিসূচক শির সঞ্চালন করিলাম। অতঃপর দেবাদিদেবের সেবা উহারা "রীতিরকম" করিয়াই করিল। কদমের সেবার বহর দেখিয়া সত্যই আমার চক্ষু চড়কগাছ হইয়া উঠিল। অন্তরে অন্তরে সে দিন কতই না তাহাকে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছি—হাঁ, সে আনাড়ি বলিবার সম্পূর্ণ অধিকারী। অস্বীকার করিবার কোনই উপায় নাই।

অভ্যাস করিতেই হইবে নতুবা মান, ইজ্জৎ আর কিছুই রহিবে না—সকলই জলাঞ্জলি দিতে হইবে দেখিতেছি। নাঃ! অভ্যাস না করিয়া আর এমুখে কখনই আসিতেছি না।

ঠাকুর দাদার তামাক অভ্যাস করিতে কিন্তু সাহসেও কুলায় না, সুযোগও পাওয়া যায় না। সুমন্ত্র প্রত্যহ আমার পদোন্নোতির খোঁজ লইতে আসে। আমি লজ্জায় মরিয়া যাই।

সেদিন ঠাকুরদাদার এক সহপাঠি বন্ধু তাহার কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহের জন্য আমাদের গ্রামে একটি কন্যা দেখিতে আসিয়া

আমাদের বাটীতেই উঠিয়াছেন। বহুদিন পরে বাল্যসাথীকে নিকটে পাইয়া ঠাকুরদাদা মহাশয়ের সে কি আনন্দ! বন্ধুকে লইয়া যে তিনি কি করিবেন যেন বুঝিতেই পারিতেছেন না। সহস্র যত্ন আপ্যায়নেও তাঁহার মন উঠিতেছে না। দাদুর বন্ধুটিকে দেখিয়াও মনে হইতেছে যেন তিনিও কতদিন পরে কি এক অমূল্য নিধি কুড়াইয়া পাইয়াছেন।

বন্ধু বান্ধবকে নিকটে পাইলে বালক বা যুবকগণই যে কেবল মাত্র উল্লাসিত হইয়া উঠেন তাহা নহে, বৃদ্ধেরাও দেখিতেছি বিশেষভাবেই পুলকিত হ'ন। বন্ধুর উপরে বন্ধুর এমনই প্রভাবই বটে! শঠ বন্ধু কিন্তু মহাশত্রুর অপেক্ষাও ভীষণ শনি! তাহারা না করিতে পারে জগতে এমন কোন কার্য্যই বোধহয় খুঁজিয়া মিলে না। যে কথা তখন বুঝি নাই পরে তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছি। যাক্—পিতামহ, বন্ধুর জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এদিকে তাঁহার বন্ধুটিও কিন্তু কেবলই বলিতেছেন,—"আরে ভায়া, বোসো বোসো, দু'দণ্ড কাছে বোসো! একটু গল্প করা যা'ক্। আমার সেবা যত্নের জন্য তুমি অত উতলা হ'য়ে উঠ্‌লে কেন? আমি কি তোমার পর?"

দন্তহীন মাড়িটি একেবারে সম্পূর্ণরূপে বাহির করিয়া পিতামহ উত্তর দিলেন,—"জগতে আপনার লোক হওয়া তো দেখ্‌ছি ভারি ঝক্‌মারি! আদর যত্ন পাবার তাদের কোন প্রত্যাশাই নেই। পর হওয়াই তো দেখছি সুবিধাজনক! কি বল?"

তিনি আর কি বলিবেন? হোঃ হোঃ করিয়া খানিকটা উচ্চহাস্য করিলেন মাত্র।

হাস্যরোল মন্দীভূত হইয়া আসিলে তিনি বলিলেন,—"হাঁ ভাই, এইবারে বসি। মনে কর দেখি কত দিন পরে দেখা! কত কথাই যে ব'লবার আছে; কিন্তু তোমার খাবার দাবার আদর যত্নের বন্দোবস্তটি একটুখানি না ক'রে এসে ব'স্‌লে তো গল্প ক'রে আনন্দ পা'ব না ভাই, ঘরে তো আর গৃহলক্ষ্মী নেই; ঠাকুর চাকর নিয়েই যে আমার কারবার—তা'দিগে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে না দিলে যে চলে না ভাই, তাই,—ওকি তোমার চোখ দু'টি যে জলে চক্‌চকে হ'য়ে উঠ্‌লো! নাঃ শুধুই তোমার এতখানি বয়েস হয়েছে। আচ্ছা এই ব'স্‌লুম। দেখি তোমার ঝোলায় কত গল্প আছে, উজাড় কর।"

"তোমার নাতিটি যদি তা'র ঠাকুর্দ্দার ঝোলাটিতে ছিঁটে-ফোঁটা এখনও কিছু অবশিষ্ট রেখে থাকেন তো তুমিই তা' খালি কর।"

পিতামহ হাসিলেন,—"নাতিকেই শুধু দোষ দিও না ভায়া! নাতির ঠাকুর্দ্দাও কম গল্পখোর নয়। অচিরেই তার পরিচয় পাওয়া যা'বে।"

অতঃপর তা'র পরিচয় শুধু তাঁহারাই পাইলেন তাহা নহে, সুমন্ত্র এবং আমিও পাইয়াছিলাম।

আমি একমনে দুই বন্ধুর গল্প শুনিতেছিলাম। সুমন্ত্র আমাকে ডাকিতে আসিয়া সেও গল্পে জমিয়া গিয়াছিল।

বৃদ্ধদিগের গল্পে বালকেরা জমিয়া উঠিল ! হইতে পারে ইহা আশ্চর্য্য ! বাস্তবিক সেইদিন সেইরূপই হইয়াছিল। গল্পের মত গল্প হইলে সকল বয়সীকেই বোধ হয় তাহা মাতাইতে পারে। আমরা যেমন সেদিন বৃদ্ধের গল্পে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তেমনি অনেক বৃদ্ধকেও তো তন্ময় হইয়া বহু শিশুপাঠ্য গল্প-পুস্তক পাঠ করিতে দেখিয়াছি।

যাহা হউক ছিলিমের পর ছিলিম পুড়াইয়া দুই বন্ধু গল্প করিয়া যাইতেছেন, আমরা শুনিতেছি। সুমন্ত্রের দৃষ্টিটা প্রথমতঃ বোধ হয় গড়গড়ার উপরেই বদ্ধ ছিল। সে গল্প শুনিতেছিল কিংবা গড়গড়ার সুমধুর শব্দ শুনিতেছিল অথবা কুণ্ডলীকৃত ধূম্রের অদ্ভুত ব্যায়াম ক্রীড়া পরিদর্শন করিতেছিল তাহা সেই জানে। কিছুক্ষণ পরে কিন্তু সেও যে 'গড়গড়া' ছাড়িয়া গল্পে মাতিয়াছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

গল্পের বিষয়বস্তু অবশ্য বৃদ্ধদের বাল্যকাল লইয়া আরম্ভ হইয়াই সনাতন সেকালে যাইয়া পৌঁছিয়াছিল এবং সেইস্থান হইতে মোড় ঘুরিয়া একেবারে বর্ত্তমানে আসিয়া থামিয়াছিল। তাহাদিগের মুখে সেকাল ও একালের তুলনামূলক কত সমালোচনাই না শুনিয়াছিলাম, সব কথা মনে নাই, অনেক কথা বুঝিতেও পারি নাই কিন্তু একটা কথা বিশেষভাবে এখনও মনে আছে যে গল্পের মধ্যে সেকালের যে মনোরম চিত্রটি রূপ ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছিল তাহা বাস্তবিকই অতিশয় হৃদ্য। আজ সেই 'রামও নাই বা সেকালের সে অযোধ্যাও নাই' কিন্তু

তার জন্য দু'ফোঁটা অশ্রু যদি সেকালের বৃদ্ধদিগের চক্ষুর কোণে কখন কখন জাগিয়া উঠে তাহা হইলে নবীনদিগের নিকট কি তাহারা এতই কৃপার পাত্র ?

যাহা হউক সসীম জগতে কিছুই অসীম নহে, অতএব বৃদ্ধদের গল্পও অবশেষে এক সময়ে থামিল। তাহারাও সাজিয়া গুজিয়া—অবশ্য বৃদ্ধদের উপযুক্ত বেশভূষায়—গ্রাম ভ্রমণে বাহির হইলেন। আমি ও সুমন্ত্র গৃহেই রহিলাম। পিতামহ ও তাঁহার বন্ধু, দৃষ্টির বাহিরে যাইতেই সুমন্ত্র একবার চারিদিকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল,—"পালু, বাহিরে গিয়ে পাহারা দে ! কাউকে এদিক পানে আস্‌তে দেখ্‌লেই শিস্ দিয়ে ইসারা ক'রবি। আমি গড়গড়াটা নিয়ে ততক্ষণ একবার বাবার আরাধনা করি —বুঝ্‌লি ?"

"তা' তো বুঝলুম ! কিন্তু তুই মুখে দিলে যে গড়গড়ার নলটী এঁটো হ'য়ে যাবে।"

সুমন্ত্র তাড়াতাড়ি যাইয়া নলটি উঠাইয়া লইয়া নির্ব্বিকার চিত্তে টানিতে টানিতে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া উত্তর দিল,—"ইল্লারে ! তা' বুঝি আবার হ'ন। বাবার পূজার জিনিষ কি আবার কখনও নাকি এঁটো হ'নরে গাধা ? গঙ্গার ঘাটে গিয়ে যে ছত্রিশ জাতি গঙ্গার জলে মুখ ধোয়, ত'াতে কি তিনি এঁটো হ'ন ? তা হ'ন না। তুই এখন বাহিরে গিয়ে দাঁড়া ! আবার কে এসে প'ড়বে এখুনি।"

কি করিব ? বাহিরে যাইয়া দাঁড়াইতে হইল। আমার তখন

কাঁচপোকাগ্রস্ত আরশোলার ন্যায় অবস্থা। সুমন্ত্রের আদেশ প্রত্যাখ্যান করিবার মত শক্তি বা সাহস আমার ছিল না। বাহিরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ আকাশ পাতাল ভাবিতেছি।

সুমন্ত্র পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া আদেশের স্বরে বলিল,—"যা, তুই গিয়ে এবারে বাবার সেবা কর্‌গে যা! আমি দাঁড়াই।"

আমি বলিলাম,—"না ভাই, আজ থাক্। ও খেলে গায়ে মুখে ভারি বিশ্রী গন্ধ হয়। তা' ছাড়া যদি বমি টমি ক'রে ফেলি তা হ'লে ভারি—"

সুমন্ত্র কথাটা শেষ করিতেই দিল না, বলিল,—"আরে বমি হবেন না, ছাই হবেন! এতো আর কদমের 'দা-কাটা' তামাক নন, এ যে 'বিষ্টুপুর বালাখানা'। কেমন 'আবার খাব আবার খাব' গন্ধ, দেখলি না! বেকুব! আর গন্ধ যদি এক আধটু হ'নই রে, না হয় দু'টো পেয়ারার পাতা চিবিয়ে ফেল্‌লেই চুকে যা'বেখন। আচ্ছা আনাড়ি তো তুই! তোকে দিয়ে যদি কিচ্ছু হয়।"

আবার সেই আনাড়ি! মরিয়া হইয়া উঠিলাম। আমি যে আনাড়ি নই, কাজের লোক, তাহার পরিচয় দিতেই হইবে, নতুবা মুখ দেখাইবার আর কোন প্রকার উপায়ই থাকিবে না তাহাই ভাবিতেছি।

সুমন্ত্র তাড়া দিল,—"যা! যা! মোদ্দা দেরী করিস্ নি! ওদিকে আগুন দেবতা আবার নিবে যাবেন।"

নাঃ, আর দেরী নহে। সুমন্ত্রের তাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া নল উঠাইয়া ধীরে ধীরে টানিতে লাগিলাম। নাঃ! সেদিনকার 'পূজোর থানের' তাম্রকুটের মত এ তত বিশ্রী নহে। যদিও কাশি আসে তথাপি আস্তে আস্তে একটু একটু টানাও চলে।

দরজার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া আপন মনে দেবাদি-দেব মহাদেবের ধ্যান করিতে করিতে মাঝে মাঝে সমাধিমগ্ন হইতেছিলাম, এমন সময় কর্ণাকর্ষণে এত সাধের সমাধি একে-বারে ভগ্ন হইয়া গেল।

রিণির বাবা প্রভু খুড়ো অর্থাৎ যাঁহার কন্যার সহিত পিতামহের বন্ধুপুত্রের বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছে, তিনি সজোরে আমার কর্ণমর্দ্দন করিয়া বলিতেছেন,—"ওরে হতভাগা, তোকে না ভাল ব'লেই জানতুম, তোর এই কাজ! তোর ঠাকুর্দ্দা কোথায় গেল! দাঁড়া আজ কত ধানে কত চাল, ত'ার মজাটা টের পাইয়ে দিচ্ছি।"

কি বলিব! আমি তো ফঁাসীর আসামী। অষ্টমী পূজার পাঁঠার মত—সরবে নহে নীরবেই কাঁপিতে লাগিলাম। সুমন্ত্রের উপর মনের ভিতর একটা সুবিপুল অভিমানের উত্তাপ জাগিয়া উঠিল। বিপদ দেখিয়া সে আমাকে সাবধান না করিয়াই সরিয়া পড়িয়াছে। শুধু তাহা হইলেও কথা ছিল না। পরে জানিয়াছি—সেই আমাকে ধরাইয়া দিয়াছে। প্রভু খুড়োকে দূরে আসিতে দেখিয়াই সে তাহার নিকট স্বতঃপ্রবৃত্ত

প্রভু খুড়ো আমার কর্ণ মর্দ্দন করিয়া বলিলেন,—"ওরে হতভাগা, তোকে না ভাল ব'লেই জানতুম, তোর এই কাজ ?......"

হইয়া তাহাকে এক মজা দেখাইতে চাহে এবং দরজার নিকট পর্য্যন্ত তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দিয়া সরিয়া পড়ে।

তখন জগতের রীতিনীতি সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই তো ছিল না, তাই বালকবুদ্ধিতে সুমন্ত্রের মিথ্যাচারের উপর অভিমান করিয়াছিলাম কিন্তু এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি সে অভিমান আমার কতই না বৃথা হইয়াছিল। সুমন্ত্র তো তখন বালক মাত্র! কত কত লোক যাহাদিগকে অতি মহৎ ও পরম মহাশয় ব্যক্তি বলিয়া আমরা জনসাধারণগণ মনে করিয়া থাকি, তাহাদিগের অনেকেরই যে কথায় ও কার্য্যে কোনই সাদৃশ্য নাই, তাহা ভুক্ত-ভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। তাহাদিগের অনেকের অসরলতা ও মিথ্যা ব্যবহার দেখিয়া অনেক সময়েই মনে হয় না কি তাহাদিগের অপেক্ষা রাজপথের অনেক ভিক্ষুকও অধিক সত্যবাদী?

কিন্তু দুঃখ করিয়া তো কোন লাভ নাই। এই সেবারে ছুটিতে কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিবার সময় একটা ব্যাপার ঘটিয়াছিল। অত দুঃখেও আমাদিগের সেই সততার কথাটা তখন মনে পড়িয়াছিল।

সেদিন ষ্টেশনে কি ভিড়! কয়েকজন বন্ধুর সমাদরের কল্যাণে ষ্টেশনে পৌঁছাইতে অত্যধিক বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। মালপত্র আর ‘লাগেজ’ করা হইল না। বন্ধুদিগের সাহায্যে কোনপ্রকারে ‘গেট’ পার হইয়া আসিয়া গাড়িতে চাপিয়া বসিলাম। গাড়ীও ছাড়িয়া দিল। তখন ‘লাগেজের’ কথা মনে হইল।

রাস্তায় না জানি, গাড়ীর 'চলন্ত-টিকিট-পরীক্ষকের' হস্তে কি নিগ্রহই না ভোগ করিতে হয়! সভয়ে সেইকথা একজন পার্শ্ববর্ত্তী আরোহীকে জানাইলে তিনি অভয় প্রদান করিয়া বলিলেন,—"কিছু ভয় ক'রো না ছোকরা! আমরা দশজন এক জায়গারই যাত্রী। আমাদের সাথে জিনিষপত্রও বিশেষ কিছুই নেই। তোমার জিনিষগুলি আমাদের ব'লে আমরা স্বীকার ক'রলেই সকল 'ল্যাঠা চুকে' যা'বে।"

অপর সহযাত্রীরাও সকলেই সেই কথায় একবাক্যে 'সায়' দিলেন,—"নিশ্চয়, নিশ্চয়, কোন চিন্তার কারণ নেই।"

চিন্তার কারণ যখন নাই তখন নিশ্চিন্তই হইলাম। তারপর যথাসময়ে 'ফ্লাইং চেকার' আসিয়া উপস্থিত হইলে আমাকে চঞ্চল হইয়া উঠিতে দেখিয়া পুনরায় ফিস্ ফিস্ করিয়া আর এক প্রস্থ সাহস প্রদান করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হইলেন না বটে কিন্তু চেকার টিকিট পরীক্ষা করিয়া আমার জিনিষগুলির অধিকারী কে জানিতে চাহিলে, 'আমি অবগত নহি' বলায় তিনি অপর সকলকে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সকলেই নির্ব্বিকার চিত্তে জানাইলেন যে তাঁহারা কিছুই জানেন না। অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া উঠিল। মালগুলি বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে নাকি? তখন বাধ্য হইয়াই আমাকে প্রকৃত অবস্থা সমস্তই সবিশেষ খুলিয়া বলিতে হইল।

আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ শুনিয়া চেকার মহাশয় তো হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

যাহাহউক সে ব্যাপারে আমার সততাও কিছু কম নহে তাই মাশুল ও 'ফাইন' গণিয়া দিয়া আপন সততার পুরস্কার হাতে হাতে লইয়া সেইদিন নিষ্কৃতি পাইয়াছিলাম। আজ যে কোন দিকেই কোনরূপ আলোর একটুখানি রেখাও দেখিতে পাইতেছি না, কারণ প্রভু খুড়ো যে প্রকৃতির লোক তাহাতে এতবড় মজাটা যে তিনি সম্পূর্ণরূপে উপভোগ না করিয়া কিছুতেই ছাড়িবেন না, তাহা তো জানি।

ঠাকুরদাদা আসিবার পূর্ব্বেই সরিয়া পড়িতে পারিলে যে বাঁচিয়া যাইতাম কিন্তু তাহারও তো কোন উপায় নাই। খুড়ো যে কর্ণদ্বয় সজোরেই ধরিয়া আছেন। কি তবে করা যায় ?

প্রভু খুড়ো হাসিলেন,—"চুপ ক'রে আছিস্ যে ? কথা কানে যাচ্ছে না,—না ? তোর ঠাকুর্দ্দা কোথায় গেল ?"

"বোধহয় আপনাদের ওখানেই গেছেন। ঠাকুর্দ্দা'র এক বন্ধু এসেছেন—রিণীকে দেখ্বার জন্যে, তাঁ'র ছেলের—"

"আরে থাম্! থাম্! সে আমি জানি। তা'রা কতক্ষণ গেছে ?"

"গেছেন—এই তো কিছুক্ষণ আগে।"

"আচ্ছা, তোর সাজা পরে হ'বে। এখন—" বলিয়াই প্রভু খুড়ো আমার কর্ণদ্বয় ছাড়িয়া দিয়া আমার উচ্ছিষ্ট তামাকে তাড়াতাড়ি গোটাকত টান টানিয়া লইয়া হন্ হন্ করিয়া ছুটিলেন।

আপাততঃ বাঁচিলাম। বাহিরে উঁকি দিয়া দেখিলাম,

যদি সুমন্ত্র পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া কোথাও লুকাইয়া থাকে। সুমন্ত্রের টিকিটিও কিন্তু দেখিতে পাইলাম না। সে ভাগিয়াছে। মহাদেবের সেবার নেশাও আমার সম্পূর্ণরূপেই ভাগিয়া গিয়াছে। তা' দেবাদিদেব রাগই করুন আর যাই করুন।

ঠিক করিলাম, ঠাকুরদাদা আসিলে সমস্ত খুলিয়া বলিয়া যে সাজা হয় মাথা পাতিয়া সকলই গ্রহণ করিব।

৬

যথাসময়ে পিতামহকে সমস্ত খুলিয়াই বলিয়াছি। তিনি সমস্ত শুনিয়া আমাকে ঠাকুরমাতার ভ্রাতৃ-সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“হাঁরে তুই কি মনে করিস্ যে তুই একটা মস্ত বড় বীর—একেবারেই আনাড়ি নোস্, যা’ ইচ্ছে তাই ক’রতে পারিস্, —নয় ?”

আমি লজ্জায় মাথা নত করিয়া রহিলাম।

তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—“আরে ভায়া, একদিন আমাদেরও বয়েস কাল ছিল, আমরাও ভেবেছি—‘হেন করেঙ্গা, তেন করেঙ্গা।’ কিন্তু এখন দেখছি কিছুই কর’তে পারি নি কেবল ‘খাম্‌ছা মারেঙ্গাই’ সার হয়েছে। কিন্তু যাই করি না কেন, ও বয়েসে তোর মত অবিশ্যি মহাদেবের পূজোর কথা মনেও ক’রতে পারি নি।”

ঠাকুরদাদার পদযুগল জড়াইয়া ধরিলাম,—“মাপ কর দাদু! আর লজ্জা দিও না। আর কখনও অমন কাজ আমার দ্বারা হবে না।”

ঠাকুরদাদা আমাকে তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন। বৃদ্ধের চক্ষুযুগল হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। মনে হইল তাহাতে আমার সমস্ত আপদ বালাই মুছিয়া গেল।

তিনি সজল চক্ষে বলিলেন,—"হাঁরে, বড্‌ডো লেগেছে ? প্রভু তোকে খুবই মেরেছে, নয় ?"

আমি বলিলাম,—"কৈ না !"

"সে যে ব'ল্‌লে,—'আচ্ছা ক'রে ছোঁড়ার দু'কান ছিঁড়ে দিয়েছি'।"

চুপ করিয়া রহিলাম। এখন ভাবি—দিকে দিকে দেশের কত পরিবর্ত্তনই না হইয়াছে। আমরা তখন 'দোষ-ঘাট' করিয়া যদি বড়দিগের নিকট সাজা পাইতাম তাহা হইলে তাহা ঢাকা দিবার নিমিত্ত কত চেষ্টাই না চলিত। বাড়ীতে যেন সে কথা কেহ না শুনিতে পায়, কেন না তাহা হইলে সেখানেও আর একদফা সাজার সম্ভাবনা ! আর এখন অতি বড় অন্যায় কার্য্য করিয়াও, এমন কি শিক্ষকের নিকট সামান্য একটু তিরস্কার লাভ করিয়াই, অনেক ক্ষেত্রে বালকেরা অভিভাবকের সাহায্যে শিক্ষকের বিরাট সাজার বন্দোবস্ত করিতে অগ্রসর হয়। আরও কত কি হইবে কে জানে ? সে কথা যাউক।

ঠাকুরদাদা বলিলেন,—"দেখি তোর কানটা একবার দেখি। আহা রে ! তাইতো কানটির যে আর—"

পিতামহের চক্ষু দিয়া পুনরায় জল পড়িতে লাগিল। ভাবিয়াছিলাম ঠাকুরদাদা কত সাজাই না দিবেন কিন্তু সাজার পরিবর্ত্তে অবশেষে আদরের সে এক মহাদানসাগরই সেদিন ভোগ করিয়াছিলাম। আহা সে কি অনাবিল স্নেহ।

শৈশবের তমিস্র বিদীর্ণ করিয়া একদিনের একটী ঘটনা

মনের ভিতর উঁকি দিয়া গেল। মনে পড়ে কি একটা পুস্তকে পড়িয়াছিলাম যে আদরে স্নেহে মানুষ বশীভূত না হইলেও বনের পশু বশীভূত হয়। অধীতবিদ্যা বাস্তবে সফল করিয়া তুলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম।

বাড়ীতে 'টেরি' নামক একটী সারমেয় শাবক বাস করিত। তাহাকে কি যত্নই না করিতে লাগিলাম। আপন আহার্য্যের সার অংশটুকু তাহাকে খাইতে দিলাম। তাহার জন্য উত্তম শয্যা প্রস্তুত করিলাম। 'বক্‌লসে' রূপার পাত বসাইয়া উহার নাম খোদাই করিয়া দিলাম। এইরূপ কত কি-ই যে করিলাম।

একদিন কাঁঠাল গাছে দোলা টাঙাইয়া, আদর করিয়া তাহাতে 'টেরি'কে বসাইয়া যেমন তাহাকে দোল দিয়াছি অমনি প্রভুভক্ত সারমেয় শাবকটী যাহা করিল তাহা বোধহয় অতি বড় নিমকহারাম মানব-সন্তানও করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। নাঃ, নিশ্চয়ই পারিত না। কারণ সেই সব মহাশয় মনুর সন্তানেরা সাধারণতঃ 'সাম্‌নাসাম্‌নি' দংশন তো করে না। তাহারা আঘাত করে পশ্চাতে; আর এ হতভাগা কুকুর-সন্তান ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সম্মুখেই আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া দেহটীকে 'চিত্রকদলী'র চরম নিদর্শন করিয়া তুলিল।

সেইদিন একবার পিতামহকে এমনি করিয়াই আমাকে বুকে জড়াইয়া কাঁদিতে দেখিয়াছিলাম। সেইদিন তাঁহাকে যখন আমার

কল্পনার নির্ম্মম পরাজয়ের কথা খুলিয়া বলিয়াছিলাম তখন তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন—'ইতর প্রাণীকে ভালবাসার অর্থ তাহাদিগের স্বাধীনতা অপহরণ করা নহে। মানুষকে যদি সোনার কারাগারে বন্ধ করিয়া তিন বেলা চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় ভোজ্য খাইতে দেওয়া হয় তাহা হইলেই কি সে পুলকে শিহরিয়া উঠে? তাহাতো উঠে না। সেইরূপ কুকুর· বিড়াল প্রভৃতি ইতর প্রাণীরাও সোনার বকলসে আবদ্ধ থাকিয়া রূপার দোলায় দোল খাইলেও তাহারা সুখী হয় না।'

আর আজ উপদেশ পাইলাম,—'উচ্ছৃঙ্খলতার নাম স্বাধীনতা নহে এবং তাহাতে দুঃখ ছাড়া আনন্দ কখনই পাওয়া যায় না।

সেদিন যেমন পিতামহের বাক্যে লজ্জিত হইয়া 'টেরি'র গলার বকলস খুলিয়া দিয়াছিলাম ও সমস্ত পাখী খাঁচা খুলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম আজও তেমনি প্রতিজ্ঞা করিলাম দেবাদি-দেবের মহাপূজা এইখানেই সাঙ্গ। যত বড় কাপুরুষই তাহার জন্য হইতে হয় হইব তথাপি আর না—ইতি শেষ।

চ

এইবার প্রভু খুড়োর বিষয় কিছু বলিব। প্রভু খুড়োর মেয়ে রিণী—গোবরে পদ্মফুল! রিণী গরীবের ঘরের মেয়ে বটে কিন্তু অমন রূপ রাজারাজড়ার ঘরেও বড় একটা দেখা যায় না। তাহার আসল নামটি তবু ভারি বিশ্রী,—আহ্লাদী। কেন, গরীবের ঘরে যদি ঐরূপ রূপসী কন্যা জন্মাইলে মহাভারত শুদ্ধই থাকিয়া যায় তবে নামটা একটু পালিস্ করা হইলেই কি ভাগবত অশুদ্ধ হইয়া যাইত? কত 'হেঁজিপেঁজির' নামও তো শরৎশশী, "দেখনহাসি" শুনিতে পাই—তবে?

তাহা নহে, যেমন পিতা, তাহার রাখা নামও তেমনি। তাই আমাদের গ্রামের জমীদার বাড়ীর গিন্নীমা নামটা তাহার পাল্টাইয়া রাখিয়াছেন—আদরিণী এবং তাহার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হইতেছে রিণী। গিন্নীমা তাহাকে আদর করিয়া কখনও কখনও আদরিণী, নির্ঝরিণী কখনও বা রাজরাণীও বলিয়া থাকেন।

সেই ছোট্ট একটুখানি মেয়ে রিণী, কালো রেশমের মত একরাশ কুঞ্চিত কেশ বাতাসে উড়াইয়া দিয়া যখন নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া বেড়ায় তখন তাহার পরিধানের অতি মলিন ছিন্নবস্ত্র যেন লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তাই বোধ হয় তাহার বেশবাসের দীনতা কাহারও দৃষ্টিতে পতিতই হয় না। মনে হয় লক্ষ্মীপ্রতিমাটি যেন 'ঘুরঘুর' করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

এ হেন লক্ষ্মী মেয়েটি, শৈশবে মাতৃহারা হইলে, তাহার পিতার অর্থাৎ আমাদের প্রভু খুড়োর, সংসারের প্রতি অতিশয় বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তিনি কণ্ঠিতিলক ধারণ করিয়া পরম বৈষ্ণব হইয়া উঠিলেন এবং অচিরে নিদ্রিতা শিশুকন্যাকে একাকী গৃহে ফেলিয়া রাখিয়া পারের কাণ্ডারী খুঁজিতে বহির্গত হইলেন।

পিতৃপরিত্যক্তা, মাতৃহীনা এই শিশুকন্যাকে জমীদার বাড়ীর গৃহিণীমাতা কন্যাধিক স্নেহে পালন করিতে লাগিলেন।

তাহার পর অবশ্য কালক্রমে খুড়ার বৈরাগ্য নিভিয়া আসিল। ওপারের কাণ্ডারীর সংবাদ তাঁহার কতটুকু মিলিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না কিন্তু এপারের কাণ্ডারী দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী লইয়া যেদিন তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন, সেদিন সেই পরিত্যক্তা কন্যাকে, দ্বিতীয় পক্ষের ফরমাইস খাটিবার জন্য প্রয়োজন হইল। অতএব রিণীকে গিন্নীমার নিকট হইতে পুনরায় তাহার পিতার নিকট ফিরিয়া যাইতে হইল।

পরের মেয়েকে কি জোর করিয়া ধরিয়া রাখা যায়? না তাহাই উচিত? রিণীর প্রতি গিন্নীমার স্নেহ কিন্তু কিছুমাত্র হ্রাস তো হইলই না অধিকন্তু উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। তিনি কিছুতেই রিণীকে পর মনে করিতে পারিতেন না। রিণীও তাঁহাকে জননীর অধিক শ্রদ্ধাভক্তি করিত। সে গিন্নীমার নিকট হইতে বাঙ্গালা লেখাপড়া বেশ ভালই শিখিয়া- ছিল। এই বয়সেই রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি অনেক পুস্তকই

সে সুন্দর পড়িতে পারিত। গিন্নীমার নিকট শুনিয়া শুনিয়াও ইহা ছাড়া সে অনেক কিছু শিখিয়াছিল।

অনেকদিন আগেকার কথা হইলেও একদিনকার একটি ঘটনা এখনও বেশ মনে আছে। রিণী তখন খুবই ছোট। ঠাকুরদাদার এক সুন্দর ফুলের বাগান আছে। দাদুর ভারি-ই ফুলের সখ! কত রকমের ফুলই যে সে বাগানে আছে! সে ফুলের গায়ে কিন্তু কাহারও একটুখানি হাত দিবারও উপায় ছিল না; এমন কি আমার—তাঁহার অতি আদরের একমাত্র নাতিরও নহে। এই সম্বন্ধে একটি কথা মনে পড়িল। রিণীর কথা বলিবার পূর্ব্বে অগ্রে সেই কথাটি শেষ করি।

বাগানে তো দাদুর নানাপ্রকারের ফুলের গাছ ছিলই তদ্ভিন্ন আমার পড়িবার ঘরের সম্মুখে অনেকগুলি টবেও তিনি বহুবিধ গাছ রোপণ করিয়াছিলেন। বহু যত্নের পর টবের এক গোলাপ গাছে কুঁড়ি ধরিয়াছিল। কোরকটি দিনে দিনে বাড়িয়া প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিয়াছিল। পিতামহ দিনের ভিতর কতবার যে আসিয়া কুঁড়িটিকে দেখিয়া যাইতেন তাহা আর কি বলিব? কোরকটি বোধহয় আগামী কল্যই সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইবে। পিতামহের সে কি উল্লাস!

আমার পড়িবার ঘরটি ছাদের উপর সিঁড়ির পার্শ্বেই। ছাদে ওই একখানি মাত্র ক্ষুদ্র ঘর। আমার লেখা-পড়া শেষ হইলে নামিয়া যাইবার সময় সিঁড়ির দরজায় তালা লাগাইয়া নামিয়া যাইতাম। উহার একটি চাবি আমার কাছে এবং আর একটি

থাকিত পিতামহের নিকট সুতরাং অপর কাহারও ছাদে উঠিবার উপায় ছিল না।

সেদিন দ্বিপ্রহরে আমি একখানি ছবির বই লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি এমন সময় দাদু আসিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন,—"পালু, তুমি গোলাপের কুঁড়িটি নখ দিয়ে চিরে চিরে রেখেছ কেন ?"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—"নখ দিয়ে চিরেছি মানে ? কৈ আমি তো আপনার গোলাপের গাছে হাতও দি-ই নি।"

তিনি বলিলেন,—"গাছে হাত না দিয়ে থাক কুঁড়িতে দিয়েছ ; নইলে কুঁড়িটিকে অমন ক'রে নিশ্চয়ই ভূতে চিরে দিয়ে যায় নি। ছাদে তো তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ আসে না। তুমি যদি না ক'রে থাক তবে কি ব'লতে চাও কুঁড়িটির ওরূপ দুর্দ্দশা আমি ক'রেছি ?"

আমি কিছুই না বলিয়া দৌড়াইয়া টবটির নিকটে গিয়া দেখিলাম সত্য সত্যই কোরকটির উপরকার পাঁপড়ির উপরে আঁচড়ের দাগ সুস্পষ্ট ! কে যেন উহা নখ দিয়া চিরিয়া চিরিয়া রাখিয়াছে। উহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সত্যই আমি উহা স্পর্শও করি নাই। আমার নির্দ্দোষিতার কথা দাদুকে বহুপ্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু তিনি কিছুতেই বুঝিলেন না।

বয়স্ক ব্যক্তিরা শিশু বা বালকদিগের সকল কথাই আপনা-দিগের ইচ্ছামত না হইলেই যে কেন অবিশ্বাস করেন বুঝি না।

পিতামহ কেবল বলিলেন,—"পালু, আগে তো তুমি কখন মিথ্যা কথা ব'লতে না।"

ইচ্ছা হইল বলি,—কি করিয়া জানিলেন যে এখন-ই মিথ্যা বলি! কিন্তু কোন কথাই বলিতে পারিলাম না। অভিমানে কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হইয়া আসিল। পিতামহ চলিয়া গেলেন।

পরদিন কোরকটি সম্পূর্ণরূপেই প্রস্ফুটিত হইল। গোটা-কয়েক ছিন্ন পাঁপড়ি নীচের দিকে রহিলেও তাহার সৌন্দর্য্য বিকাশের কিছুমাত্র হানি হইল না।

পিতামহ মহাশয় দুঃখটা বোধহয় ভুলিলেন। তাঁহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। একদিন নির্ব্বিবাদে কাটিয়া গেল। পর-দিন ফুলটি আরও বৃহদাকার ধারণ করিল। দেখিয়া দাদুর সহিত আমিও মুগ্ধ হইলাম। ফুলের মত সুন্দর জিনিষ পৃথিবীতে বোধহয় আর দ্বিতীয় নাই। তাই তো দেবতার পূজার প্রধান উপকরণ ফুল। এমন সুন্দর জিনিষ নষ্ট হইলে সত্যই কাহার না দুঃখ হয়? দাদুর রাগ নিতান্তই অকারণে নহে। পড়িবার ঘরে বই সম্মুখে রাখিয়া বসিয়া বসিয়া এই সমস্তই ভাবিতেছি। এমন সময়ে ফুলটির দিকে দৃষ্টি পড়িতেই দেখি—একটি বায়স-প্রবর চঞ্চুর সাহায্যে সৌন্দর্য্য চর্চ্চা করিতেছেন। কাক যে কখনও চঞ্চুর আঘাতে একটি একটি করিয়া ফুলদল ছিঁড়িয়া বিশ্লেষণ করিতে থাকে তাহা তখন জানা ছিল না। তাই তখন বিস্মিত হইয়া দাদুকে ডাকিয়া তাঁহার ফুলের সমঝদারকে দেখাইবার নিমিত্ত উঠিয়া নীচে যাইবার উপক্রম করিতেছি এমন সময় দেখি

তিনিই কি কাজে ছাদে আসিতেছেন। ইসারায় তাঁহাকে ব্যাপারটি দেখাইলাম।

তিনি দেখিয়া হৈ হৈ করিয়া উঠিলেন। বায়স মহাশয় স্বীয় কর্ত্তব্য প্রায় সমাধা করিয়া আনিয়াছিলেন। পিতামহের হৈ চৈ শুনিয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই বোধহয় কয়েকটি পাঁপড়ি অবশিষ্ট রাখিয়া রঙ্গস্থল পরিত্যাগ করিলেন। পিতামহের সে কি আফ্‌সোস !

বেদনার মাত্রা একটু হ্রাস প্রাপ্ত হইলে আমার প্রতি তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। কি আদরই যে সেদিন তিনি আমাকে করিয়াছিলেন ! মনে করিতে এখনও চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া আসে। আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তিনি বলিলেন,—"আমি তোকে মিথ্যাবাদী ভেবেছিলুম পালু, তুই আমার অন্যায় ভুলে যাস্।"

"কি যে বল দাতু !" বলিয়া আমিও তাঁহার পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়াছিলাম।

আমার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ পাইয়া তিনি যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার পুষ্পের শোক ভাসিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া গোলাপ-গাছের কথাও তিনি ভুলেন নাই। অতঃপর তারের জালে টবগুলি আবৃত করা হইয়াছিল। তাই মনে হইত ফুল যেন তাঁহার প্রাণ ! কিন্তু এ হেন ফুলের বাগানেও রিণীর অবারিত দ্বার ! ফুলের জন্য প্রায়ই রিণী বুড়াকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। বুড়া হাসিমুখে তাহার সব অত্যাচার সহ্য করিতেন।

সেদিন সবেমাত্র কাক, কোকিলের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। ফুলেরা পাতার ঘোমটা সরাইয়া কেবলমাত্র দুনিয়াটা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য উঁকি দিতে আরম্ভ করিয়াছে। মলয় বাতাস ধরণীর বুকে শিহরণ তুলিয়া ঝির ঝির করিয়া এইমাত্র প্রবাহিত হইতে সুরু করিয়াছে।

চিরকালই দাদু অতি প্রত্যূষেই শয্যাত্যাগ করিয়া থাকেন। এমন সময় রিণী লক্ষ্মীঠাকরুণটির মতই ধীরে ধীরে সদর দরজায় আসিয়া ডাকিল,—"দাদু, দোরটা খুলে দাও না ভাই!"

আমি বিছানায় শুইয়াই শুনিতেছি উত্তর হইল,—"দোর-খোলাই আছে, ঠেলে আয় না।" রিণী নিকটে আসিলে দাদু হাসিয়া বলিলেন,—"এত সকালেই যে বড় ছুটে এসেছিস, মুখ্‌পুড়ি! ব্যাপারখানা কি?"

মুখ্‌পুড়ী উত্তর দিল,—"আহা কিছু যেন জানেন না আর কি! আজ ঠাকুরের দোল না! ফুল তুল্‌তে হ'বে না? পালু-দা'র এখনও বুঝি ঘুমই ভাঙেনি। বাবা! কি ঘুম মা, আজকের দিনটাও একটু সকালে উঠ্‌তে পারেনি? সে কি জানে না যে আজ আমাকে ফুল পেড়ে দিতে হ'বে!"

ঠাকুরদাদা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"তোর বুঝি রাত্তিরে একটু ঘুমও হয়নি, না রিণি!"

"না হয়নি, তোমার যেমন কথা দাদু! মানুষ কত ঘুমুতে পারে বাপু!"

"তবে যেটুকু ঘুমিয়েছিস্ কেবলি বোধহয় স্বপ্ন দেখেছিস্ যে

আবন, টাবু, গুট্‌কু, অমু, ভোলা, ভেলু—এরা তোর আগে এসে সব ফুল তুলে' নিয়ে গেল। তোর ঠাকুরের তরে আর কিছুই রইল না।"

রিণী অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া কহিল,—কি যে বল দাদু! আমার ঠাকুরের জন্যে না রেখে আবার কেউ কি সব ফুল নিতে পারে? সাধ্য কি! আমার ঠাকুরই তো ফুল দেবার মালিক গো-মশাই! ঠাকুর ফোটায় তবেই না ফুল ফোটে। আমার ঠাকুরের ফুলে কি আবার কেউ হাত দিতে পারে?"

দাদু বলিলেন,—"এত কথা তুই শিখ্‌লি কোথায় ভাই?"

"কেন গিন্নীমার কাছে যে আমি সব শুনেছি দাদুভাই!"

দাদু বলিলেন,—"ঠিক শুনেছিস্ দিদি! তাঁর জন্যেই তো ফুল ফোটে। যে ফুল তাঁ'র সেবায় না লাগে, সে ফুলের জীবনই বৃথা! মেয়েদের জীবনও যে এই ফুলের মতই, দেবতার সেবাতেই তা'র সার্থকতা। আর মানুষও সবাই ভগবানের সন্তান। মানুষকে সেবা ক'রলেই ভগবানের সেবা করা হয় একথাটাও সব সময় মনে রাখিস্ দিদি। আর সব সময় ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখিস্ জীবনে কোন দুঃখ কষ্টই তোর কাছে ঘেঁসতেও পাবে না।"

এমন সময় আমি বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া একটু রাগের ভাণ করিয়াই বলিলাম,—"ব্যাপার কি দাদু, এত হাঁক ডাক কিসের? ও রিণাঠাক্‌রুণ এসে হাজির হয়েছেন দেখ্‌ছি। আচ্ছা রিণি! তোর জন্যে কি মানুষ একটু 'নিশ্চিন্দি' হ'য়ে ঘুমুতেও পাবে না?

রিণীর চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল,—"তুমি কি আর জন্মে

রিণী বলিল,—"পড়াশুনা বুঝি তোমারই কেবল ক'রতে হয়, আমার হয় না মনে কর ?" (৫০ পৃঃ)

কুম্ভকর্ণ ছিলে পালুদা' ! এত ঘুমিয়েও তোমার সখ মিট্‌লনা! আরও ঘুমুতে চাও ?"

রাগিয়াই বলিলাম,—"কি-ই-ঈ আমি কুম্ভকর্ণ ? তবে তো আমি রাক্ষস। তবে আমার রাক্ষসের মত খাবার কই ? নিয়ে আয় দু'পাঁচশো মণ রসোগোল্লা, কাঁচাগোল্লা, পান্‌তো।"

রিণী যোগ করিল,—"সিঙ্গাড়া, কচুরি, .জিলিপি, মিহিদানা, মতিচূর—"

দাদু হাসিয়া বলিলেন,—"কুম্ভকর্ণ বুঝি ওইগুলো সব খেতেন—কেমন ? জান্‌তুম না তো ! রামায়ণে কোথাও পাই নি কিনা। ভালই, জানা গেল। তা বেশ ! কুম্ভকর্ণ ওকে ফুল-গুলো তুলে দিয়ে এসে যা' পেটে ধরে খেয়ে নিয়ে প'ড়তে বসুক।"

গুণ-ছেঁড়া ধনুকের মতই সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বুক ফুলাইয়া বলিলাম,—"পারবো না আমি ! ওর মত শুধু ফুল তুলে বেড়া'লে তো আমার চ'লবে না, আমায় পড়াশুনো ক'রতে হবে তো।"

রিণী বলিল,—পড়াশুনা বুঝি তোমারই কেবল ক'রতে হয়, আমার হয় না মনে কর ? আমিও যে রোজ রোজ বাবুদের বাড়ীর গিন্নীমার কাছে পড়ি মশাই, তা বুঝি আর জান না। রামায়ণ প্রায় আমার শেষ হ'য়ে এসেছে।"

হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলাম,—"তবে তো তুমি মস্ত বড় একটা ইয়ে কিনা বিদ্যাদিগ্‌গজী হয়ে প'ড়েছ আর কি ?"

দাদু কিন্তু এবারে তাড়া দিলেন,—"পালু, তুই কি সব কাজ ছেড়ে আজ কলহই ক'রবি নাকি ?

রিণীর উপর রুখিয়া উঠিয়া বলিলাম,—"চল্ মুখপুড়ি। আগে তোর ফুলই তুলে দিয়ে আসি, চল্। তারপর তোর বিদ্যার দৌড় একবার পরখ ক'রে দেখা যাবে—কত বড় খনা, লীলাবতী তুই হ'য়েছিস্।"

এক ঝলক বসন্ত বায়ুর নির্ম্মল প্রবাহের ন্যায় রিণী তখন উদ্যান অভিমুখে ছুটিয়া চলিল। আজ কালকার হিসাবে না হইলেও—সেই রিণী বড় হইয়াছে। তাহাকে বিবাহের জন্য দেখিতে আসিয়াছে। হয়ত বিবাহও হইয়া যাইবে। খুবই আনন্দের কথা ! কিন্তু এই আনন্দের দিনে তাহার পিতা আমাকে সাজা দিলেন। দিয়াছেন ভালই ! অপরাধ করিয়াছি, সাজা পাইলাম ! কিন্তু বুকের ভিতর কি একটা খচ্ খচ্ করিয়া যেন বিঁধিতেছে।

প্রভুখুড়ো বড় দুষ্ট ! তাহা হউন। ভগবান ! পিতার দোষে সন্তান যেন কষ্ট না পায়। মাতৃহারা রিণীর যেন কোন অমঙ্গল না হয়।

অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুমুনিকে দশরথ বধ করিলেন, ফলে রামচন্দ্রের দুঃখ-পরিতাপের সীমা পরিসীমা রহিল না। এইরূপই তো হইয়া থাকে।

শুধু পিতার অপরাধে সাজা পাইলেও সন্তানের পক্ষে সান্ত্বনা ছিল ; কিন্তু এজগতে মানুষকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তো

অপরের অপরাধের বোঝাই মাথা পাতিয়া লইতে হয়। একে অন্যায় করে অপরে সাজা পায়। একজন রোজগার করে, অপরে ফাঁকি দিয়া লইয়া ভোগ করে। টুপি রামের অথচ মাথায় পরে শ্যাম। এই সব ঘটনার তো আর অভাব নাই। সকলেই তো দিবারাত্র ইহাই দেখিতেছি। যাহারা একের কাঁটাল অপরের মাথায় ভাঙ্গিয়া খাইতে পারে, তাহারা লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক বরঞ্চ বক্ষস্ফীত করিয়াই বেড়ায় এবং সাধারণের নিকটও ফুল বিল্বপত্রেই বুদ্ধিমান বলিয়া পূজিত হইয়া থাকে। ইহাই তো আধুনিক রীতি।

প্রভুখুড়োও এই রীতির বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করেন নাই। সেই কথাই এইবার খুলিয়া বলিতেছি।

পিতামহের বন্ধু-পুত্রের সহিতই রিণীর বিবাহ স্থির হইয়া যথাসময়ে পরিণয়-ক্রিয়াও সমাধা হইয়া গেল, কিন্তু বিবাহ সৌষ্ঠবের সহিত নির্ব্বিঘ্নে তো সমাধা হইলই না পরন্তু বিশেষ গোলযোগই হইল। রিণীর বিবাহে জমিদার বাড়ীর গিন্নীমা নগদ পাঁচশত টাকা ও বেনারসী শাড়ী, কাপড়, গহনা প্রভৃতি মোটামুটি যাহা কিছু আবশ্যক তাহা সমস্তই তাঁহার পালিতা কন্যার নিমিত্ত প্রভুখুড়োকে প্রদান করিয়াছিলেন। প্রভুখুড়ো সমস্তই সহাস্যবদনে ঠিক আত্মসাৎ নয় পত্নীসাৎ করিয়া কন্যাকে শাঁখা শাড়ী দিয়া পাত্রস্থা করিলেন এবং সামান্য কারণে ছলনার সাহায্য লইয়া বরযাত্রদিগের সহিত কলহ বাধাইয়া তাহাদিগকে 'পাতা পাড়িবার' সুযোগ না দিয়া হাঁকাইয়া দিলেন।

অতঃপর কপালে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হায়! হায়! সব পণ্ড ক'রলে! আমার এত বন্দোবস্ত সব পণ্ড ক'রলে! পায়ে ধ'রলুম মশাই, তাও শুন্‌লে না। বলে কিনা 'নেহি খায়েংগা' আরে তোরা কি কখন মেয়ে কি বোনের বিয়ে দিস্ নি? এমনি ক'রেই কি গরীবের মনে কষ্ট দিতে হয়? গরীব ব'লে কি সাধ আহ্লাদ তা'র কিছুই থাকতে নেই? ভেবেছিলুম বেয়াই লোকটি ভাল, কিন্তু হায়রে কপাল! বলে "অভাগা যেখানে যায় সাগর শুকিয়ে যায়।" আমার কপালেও তাই হ'ল। তিনি দাঁড়িয়ে থেকে এই সব কেলেঙ্কারীগুলো দেখ্‌লেন তবু মুখ ফুটে বরযাত্রদিগকে একবার ব'ল্‌লেন না যে ভদ্রলোকের জিনিষগুলো নষ্ট হ'বে। তোমরা কি ক'রছো? বরঞ্চ ব'ল্‌লেন 'আচ্ছা, তোমরা যাও! খোকার বে হ'য়ে গেলে ছেলেবউ সঙ্গে ক'রে আমি-ই যা'ব। আহারে! আমাকে একেবারে 'কেতাথ' ক'রবেন আর কি!"

কে একজন বলিলেন,—"তা' আপনার বেয়াইকে ভালই ব'লতে হবে বৈকি,—ছেলেকেও তো বরযাত্রদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেন নি, বিয়ে দিয়েই তবে ছেলেকে নিয়ে গেছেন।"

মুহূর্ত্তে ভদ্রতার মুখোস খুলিয়া ফেলিয়া প্রভুখুড়ো এইবার স্বমূর্ত্তি ধারণ করিলেন,—"কেরে? কে একথা ব'ললে? ছেলে তুলে' নিয়ে যা'বে—'শম্মারামে'র বাড়ী থেকে? বলে ঠেঙিয়ে বাপ্‌তো বাপ্, চোদ্দপুরুষের নাম ভুলিয়ে দেব না!"

দুষ্টকে দেখিয়া ভগবানও নাকি শঙ্কিত হ'ন, মানুষের কথা

তো দূরেই থাকুক। সহসা প্রভুখুড়োর এইরূপ 'মারমূর্ত্তি' দেখিয়া যে ভদ্রলোক পূর্ব্বোক্ত কথা বলিয়াছিলেন তিনি সরিয়া পড়িলেন।

অতঃপর প্রভুখুড়োর কর্পূরের শিশির সিপি সম্পূর্ণরূপে আল্‌গা হইয়া গেল। তাহার সুগন্ধে তিনি সমস্ত বাড়ীটি মাৎ করিয়া তুলিলেন।

হাঁ, বল্‌নেওয়ালা বটে! তাঁহার বাক্যের যুক্তি যেমন সারগর্ভ ভাষাও তেমনি ধারালো। কেহ কেহ কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিলেও অনেকেই যে বিশেষভাবে তাহা উপভোগ করিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব প্রভুখুড়ো যে মহাশয় ব্যক্তি ও তাঁহার বেহাই যে একজন অতি অমানুষ লোক সে বিষয়ে সংশয়ের আর কোন অবকাশই রহিল না।

দেখিতেছি 'মুখখিস্তি' সহকারে যে যত উচ্চ চীৎকার করিতে সমর্থ সেই ব্যক্তিই জগতে তত শক্তিমান বলিয়া পরিগণিত হ'ন উপযুক্ত মাপকাঠি দিয়া পরিমাপ করিলে প্রভুখুড়োর জোড়া মেলা সত্যই ভার! সুতরাং তাঁহার তুল্য শক্তিমান জগতে আর কে আছে? তা' নাই থাকুন কিন্তু সেই শক্তিমান হস্তের উদ্যত লগুড়ের সবখানি গিয়া পড়িল বেচারী হতভাগী রিণীরই মস্তকে। তাহার পিতৃগৃহে আসিবার পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গেল। রিণীর পিতৃগৃহের ঋণ এতদিনে বোধহয় শোধ হইল।

ছুটি

আমার ছুটি ফুরাইয়া আসিল। কয়েকদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। দুই একদিনের ভিতরই আমাকে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে হইবে।

এখানে যেরূপ পিতামহ আছেন, সেখানেও সেইরূপ মাতামহ আছেন। তিনিও আমাকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন। বোধহয় মাতুলদিগের অপেক্ষাও তিনি আমাকেই অধিক ভালবাসেন। পিতামহের সেইকথা 'দুধের অপেক্ষা সর মিষ্টি'—বোধহয় সত্যই। তারপর কলিকাতা ভারতের শ্রেষ্ঠ অদ্বিতীয় সহর। সেইস্থানে পদার্পণ করিতে পারিলেও অনেকে, বিশেষতঃ বালকেরা আপনাদিগকে ভাগ্যবান বলিয়াই মনে করে। আমার এই অজ্ঞাত, অখ্যাত পল্লীমায়ের স্নেহাঞ্চল ছাড়িয়া শীঘ্রই চলিয়া যাইতে হইবে মনে করিয়া কিন্তু আমার সমস্ত দেহ মন কেমন একপ্রকার বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিতেছে।

সুমন্ত্রের প্রতি আজ যেন এতটুকুও অভিমান নাই। মনে হইতেছে হাঁদা, কদম, রঞ্জা প্রভৃতি বালকবৃন্দই পরম সুখী। এই উন্মুক্ত উদার আকাশ, ছায়াঘেরা বন, পাখীর সুমিষ্ট কাকলী, নদীর মধুর কল্লোল,—কোন কিছুই পশ্চাতে ফেলিয়া তাহাদিগকে বিদেশে চলিয়া যাইতে হয় না।

গ্রামের অতি তুচ্ছ বস্তুও আজ অশেষ হইয়াই দেখা দিতেছে। বাঁশের ঝাড়ের নিম্নেকার সেই ক্ষুদ্র পোষ্ট অফিস, বটগাছতলায়

সেই ছোট্ট কামারশালা, অদূরে ওই মনোহারী দোকান, বারো-য়ারীতলা, হরিসভা, খেলার মাঠ এমন কি নদীতীরস্থ পাঠশালাটি পর্য্যন্ত চোখের সম্মুখে আজ কতই না মনোরম হইয়া উঠিয়াছে !

গ্রামের ভিতর অকারণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। যে সব দৃশ্য কোনদিন চোখ তুলিয়া তাকাইয়াও দেখি নাই, আজ তাহাই বারবার করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে।

বারোয়ারীতলার বটগাছে অসংখ্য বাদুড় মাথা নীচু করিয়া ঝুলিতেছে, কিঁচ্ কিঁচ্ করিয়া চেঁচাইতেছে, নেড়ি কুকুরটা কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া আছে, জমীদার বাড়ীর রাখাল মনোহর এক কোঁচড় মুড়ি ও একপাল গরু লইয়া মাঠে যাইতেছে। আহা ! তাহারা কত সুখী ! কোন ভাবনাও নাই, চিন্তাও নাই। আজ কেবলিই মনে হইতেছে, বাড়ীর ইট, কাঠ, চূণ, বালি এমন কি গ্রামের পথের সামান্য ধূলিকণাও যদি হইতে পারিতাম তাহা হইলেও না জানি কত আনন্দ পাইতাম ! সহসা একটা টিক্‌টিকি কোথা হইতে টিক্‌টিক্ করিয়া উঠিল। তুড়ি দিয়া বলিলাম,—"ঠিক্‌ঠিক্।"

হায় ! ওই টিক্‌টিকিটাও কি হইতে পারা যায় না ! কিন্তু মানুষের সব ইচ্ছাই তো আর ভগবান পূর্ণ করেন না, তাই পুনরায় ভাবিলাম,—ষ্টেশনে যাইয়া যদি দেখি ট্রেণটা চলিয়া গিয়াছে তাহা হইলে কিন্তু বেশ হয় ! কিন্তু না হইলাম টিক্‌টিকি, কি না করিলাম ট্রেণ মিস্।

অতএব যথাসময়ে কলিকাতায় দাদামহাশয়ের নিকটে যাইয়া হাজির হইলাম।

হায়রে মানুষের বিচিত্র মন! গ্রাম ছাড়িয়া আসিবার সময় যেরূপ মন খারাপ হইয়াছিল, মাতামহের স্নেহ আদরে কিন্তু দুই দিনেই আর তাহার চিহ্নমাত্রও রহিল না।

এবারে আসিয়া দাদামহাশয়ের ভিতরে একটা বিষয়ে বিশেষ পরিবর্ত্তন অনুভব করিলাম। এখন আর তিনি যখন তখন দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট করিয়া বেড়ান না। বার্দ্ধক্যহেতু শারীরিক শক্তির হ্রাসই তাহার একমাত্র কারণ নহে; অন্য কারণও ছিল।

অধিকাংশ সময় তিনি পাঠেই অভিনিবিষ্ট থাকেন। পরলোক বিষয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা যেখানে যত কিছু পুস্তক বাহির হয় তিনি তাহা ক্রয় করেন ও তাহাই লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন। পড়িতে পড়িতে ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি ক্লান্ত হইলে, সময়ে সময়ে আমাকেই উহা—বাঙ্গালা পুস্তক হইলে—পড়িয়া শুনাইতে হয়। পড়িতে পড়িতে যেখানে বুঝিতে পারি না, দাদামহাশয় সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিয়া আমার সন্দেহ নিরাকরণ করিয়া দেন। পড়িয়া পড়িয়া ও শুনিয়া শুনিয়া সেই বয়সেই আমি এক অপূর্ব্ব জগতের সুখ দুঃখের সহিত পরিচিত হইয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাই। দাদামহাশয় বলেন, মৃত্যুই জীবনের শেষ নহে। আত্মার ধ্বংস নাই, উহা অবিনশ্বর। চন্দ্র সূর্য্য যেমন সত্য, পরলোকও তেমনি সত্য। সেখানেও তোমার আমার মতই মানুষ বাস করে, তবে তফাৎ এই যে সেখানকার অতি নিম্নস্তরের মানুষও এখানকার যে কোন মানুষের অপেক্ষা সুখী, কারণ তাঁহাদিগকে আমাদিগের মত ভৌতিক দেহ ধারণ করিতে হয় না। মানবের মন যেমন

যেখানে ইচ্ছা নিমিষের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারে তেমনি এই অশরীরী আত্মারাও ইচ্ছামাত্র যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পারেন। লৌহ কবাট, কি প্রস্তর প্রাচীর কিছুই তাঁহাদিগের গতি রোধ করিতে সক্ষম নহে। তাঁহাদিগের তো মানুষের মত দেহ নাই যে পদে পদে প্রতিহত হইতে হইবে? সুতরাং ইহা অপেক্ষা আর সুখের অবস্থা কি হইতে পারে? কিন্তু ভ্রমান্ধ মানব তাহা বুঝিতে না পারিয়া মৃতের জন্য শোক করে। মৃত-আত্মা দেহ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া সমস্ত দুঃখ কষ্টের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তখন তাঁহার পরমানন্দের কথা জানাইয়া হয়ত প্রিয়জনকে শোক প্রকাশ করিতে নিষেধ করিতেছেন; প্রিয়জন কিন্তু তাহা শুনিতে পাইতেছেন না। তাই অনর্থক শোকগ্রস্ত হইয়া হা হুতাশ করিতেছেন এবং প্রিয়জনকে দুঃখ পাইতে দেখিয়া তাঁহারাও এত সুখেও দুঃখ ভোগ করিতেছেন। সেইজন্যই আমাদের শাস্ত্রে মৃতের জন্য শোক করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

আমি একদিন দাদা মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি,— "আচ্ছা, সেখানকার নিম্নস্তরের অবস্থাও যদি এখানকার যে কোন অবস্থার চেয়ে সুখকর হয় তবে তো সে আনন্দেরই কথা— সুতরাং শোক করা তো উচিতই নয় কিন্তু একটা কথা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, তবে কি পাপ পুণ্যে কোন পার্থক্যই নেই?

দাদামহাশয় আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—"নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু একথা জিজ্ঞসা ক'রবার মানে?

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"মানে এই যে পুণ্যাত্মা না হয়

উচ্চস্তরে গিয়ে উচ্চসুখ ভোগ ক'রবেন কিন্তু পাপাত্মারা নিম্নস্তরে স্থান পেলেও এখানকার চেয়ে তো সুখে থাকবেই তবে আর—"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া মাতামহ বলিলেন,— "পাপের তবে সাজা কি হল—এই তো ?" একটু থামিয়া পুনরায় হাসিয়া বলিলেন,—"প্রাচীন কালের সেই মৎস্য-নারীদের গল্পটা কি শুনিস্‌নি ? হাট থেকে ফিরতে দেরী হওয়ায় এবং পথে ঝড় জলে আক্রান্ত হয়ে একদল মৎস্য-নারী পথে এক ধনী গৃহে আশ্রয় পায়। সদাশয় ধনবান ব্যক্তি, তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কোন ত্রুটিই ক'রলেন না। উপাদেয় খাদ্য ও উদ্যান-গৃহে, দুগ্ধফেণনিভ শয্যা ইত্যাদির বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন। কিন্তু অভ্যাস মানুষের এমনি বালাই যে মৎস্য-নারীরা, সে সুখাদ্য গলাধঃকরণ ক'রতে পারলে না, সুকোমল শয্যা তাদের কাছে বিশ্রী রকমের নরম ব'লে বোধ হ'তে লাগল। ত'ারা শয্যা ত্যাগ ক'রে মেঝেতে আঁচল পেতে শুয়েও নিস্তার পেলে না, কেন না চারিদিক থেকে ফুলের সুবাস ভেসে এসে তা'দিকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুল্‌লো, তখন তা'রা আপন আপন মাছের ন্যাক্‌ড়ায় নাক মুখ আবৃত ক'রে কোন রকমে রাত কাটালে। সুখকর অবস্থাটা তা'দের কাছে কষ্টকর ব'লেই মনে হ'ল সেইরূপ পরলোকের নিম্ন-তম অবস্থা, সুখকর হ'লেও সেই স্থানের লোকগুলি কিন্তু সে অবস্থায় সুখী হতে পারে না। কেন না, সুখতো মনে ! পরলোকগত আত্মার না হয় স্থূল দেহই নাই কিন্তু মন তো আছে। মনে মনে এই সংসারের আপন জন, যা'দিকে তা'রা ছেড়ে যায় তাদের দুঃখ দেখে,

তা'দের মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে কষ্ট পেতে থাকে এবং অবশেষে 'পুনর্মৃষিকো ভব' অর্থাৎ পুনরায় এসে এই সংসারেই জন্মায় ও কষ্ট পায়। সুতরাং পাপ ক'রলেই সাজা আছে। পুণ্যকার্য্য ক'রলেই পুরস্কার আছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আচ্ছা, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, এসব তো মিথ্যা! কেন না শুনি জগৎই মিথ্যা।"

"কিছুই অসত্য নয়। মিথ্যা, সত্যের উল্টোদিক। নিম্ন-দিক না থাক্‌লে যেমন ঊর্দ্ধদিক থাকে না তেমনি ইহকাল না থাক্‌লে পরকাল থাকে না। ইহকাল মিথ্যা নয়। ইহ-কালও যেমন সত্য, পরকালও তেমনি সত্য। মিথ্যা অতিক্রম ক'রেই সত্যের রাজ্য! তাই ইহকালের উন্নতিতেই পরকালের উন্নতি। ইহকালের কিছুই পরকালে সঙ্গে যায় না একথা সত্য নয়। জ্ঞান ও ধর্ম্ম মানবের চিরসহচর। তা'রা আমা-দের পরলোকেও সাথী হয়। সেইজন্যেই প্রাণপণে মানবের জ্ঞানার্জ্জন ও ধর্ম্ম আচরণ করা উচিত।

মহামতি ষ্টেড্ "মৃত্যুর পর" (After Death) নামক পর-লোক বিষয়ক মহামূল্য বইখানি জগৎকে দান ক'রে জগতের মহোপকার সাধন ক'রেছেন। সেই মহর্ষির জ্ঞানার্জ্জনের আগ্রহের কথা শুন্‌লে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'তে হয়। বিরাট 'টাই-টানিক' নামক জাহাজ যখন জলমগ্ন হয় তখন তিনিও সেই জাহাজের একজন আরোহী ছিলেন। যখন স্পষ্টই বোঝা গেল যে জাহাজটির রক্ষা পা'বার আর কোন সম্ভাবনাই নাই এবং আরোহীদের মৃত্যু অনিবার্য্য তখন মহামতি

ষ্টেড্ একখানি পুস্তক নিয়ে প'ড়তে ব'স্‌লেন। তাঁর সেই কার্য্যে সকলকে বিস্মিত হ'তে দেখে তিনি সহাস্যে ব'ল্‌লেন,—পুস্তকখানি আমার অপঠিত। আর তো সময় হ'বে না, এই সময়ে যতটুকু জ্ঞান আহরণ ক'রতে পারি ক'রে নি।"—বলিয়া দাত্তু একটু নীরব হইলেন।

পরে কি ভাবিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এসব কথা তুই বোধহয় কিছু বুঝ্‌তে পারছিস্‌নি না?"

"পারছি তো।"

দাদামহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"পারবি বৈকি! বাঙ্গালীর ছেলে যে জন্মাবধি কবি ও দার্শনিক।"

একটু থামিয়া বলিলেন,—"সমস্ত না বুঝলেও বালকদের সমস্ত বিষয়ই পড়া বা শোনা উচিত। তা'তে লাভ বই ক্ষতি নেই।" এই বলিয়া উঠিয়া গিয়া কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের 'জীবন স্মৃতি' খানি লইয়া আসিয়া একটি স্থান খুলিয়া বলিলেন,—"জগতের এক শ্রেষ্ঠ কবির অভিমত শোন।"

মাতামহ মহাকবির বাক্য পড়িতে লাগিলেন ঃ—

"এখনকার দিনে শিশুদের জন্য সাহিত্যরসে প্রভূত পরিমাণে জল মিশাইয়া যে সকল ছেলে ভুলানো বই লেখা হয় তাহাতে শিশুদিগকে নিতান্তই শিশু বলিয়া মনে করা হয়। তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা হয় না। ছেলেরা যে বই পড়িবে তাহার কিছু বুঝিবে এবং কিছু বুঝিবে না এইরূপ বিধান থাকা চাই। আমরা ছেলেবেলায় একধার হইতে বই পড়িয়া

যাইতাম—যাহা বুঝিতাম এবং যাহা বুঝিতাম না দুই-ই আমাদের মনের উপর কাজ করিয়া যাইত।”

অতঃপর বইখানি পুনরায় রাখিয়া আসিয়া দাতু বলিলেন,—“কবিগুরু ছেলেদের প'ড়বার সম্বন্ধে যা' ব'লেছেন তাদের শোন্‌বার সম্বন্ধেও সেইরূপ মত কি ঠিক নয়? ব'লতেই বলে,—পড়া শোনা।” এই কথাগুলি বলিয়া মাতামহ হাসিতে লাগিলেন।

আমিও সহাস্যে বলিলাম,—“আচ্ছা দাতু, ভূত প্রেত তবে মিথ্যা নয়? সত্যি?”

উত্তর শুনিলাম,—“ভূত প্রেত ব'ল্‌তে সাধারণ লোকে বিশেষতঃ বালক বালিকারা যা বুঝে' থাকে তা কিন্তু মোটেই সত্য নয়। The devil is not so black as he is painted (শয়তানকে যত কৃষ্ণ বর্ণে চিত্রিত করা হ'য়ে থাকে সে তত কাল নয়)। যত রকমের কদর্য্য কিম্ভূত কদাকার রূপ হ'তে পারে, তা'দিগে তাই দেওয়া হয়। তা'দের শক্তি সম্বন্ধে যত অসম্ভব আজগুবি ও হাস্যকর আখ্যায়িকা রচনা করা যেতে পারে তা'র ত্রুটি করা হয় না। বিশেষ ক'রে নষ্টবুদ্ধি উৎপীড়ণ ও নির্য্যাতনের বিচিত্র কাহিনী তা'দের প্রতি আরোপ করা হয়-তা' মোটেই সত্য ব'লে বিশ্বাস করি না। এর মূলে নিরীহ সরল বিশ্বাসী লোক ও বালক বালিকা-দিগকে অকারণ ভীত ও সন্ত্রস্ত ক'রে অল্পায়াসে আনন্দ অনুভব ক'রবার বিবেচনাহীন প্রবৃত্তিই বোধহয় প্রথমে ওই সব গাঁজাখুরি কল্পনার সৃষ্টি ক'রেছিল। ভূত-প্রেত ব'লতে সাধারণতঃ লোকে যা'

বুঝে' থাকে, পরলোকগত আত্মা কখনই সে শ্রেণীর নয়। বিদেহ-আত্মা কখনও কা'রও অন্যায় তো করেনই না বরঞ্চ অনেক সময় মঙ্গল ক'রবার চেষ্টাই ক'রে থাকেন।"

"আচ্ছা দাদু, অনেকে এই সব বিদেহ-আত্মার দর্শন পায়, এমন গল্প তো অনেক প'ড়লুম্। কিন্তু সকলে পায় না কেন? এই ধরুন না আমার নিজের কথাই! আপনার কাছে শুনে' ও বই প'ড়ে, সময়ে সময়ে পরলোকগত আত্মার সাক্ষাৎ পা'বার জন্য কতই তো চেষ্টা করেছি কিন্তু কৈ একদিনও তো কা'রও দর্শন পেলুম না।"

দাদামহাশয় উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, আগে আমি পরলোকে যাই, তখন তোকে দেখা দেব। তা'র তো আর বেশী দেরিও নেই, অত উতলা হ'সনি।"

আমি বলিলাম,—"যান্! আপনার সব তাতেই ঠাট্টা! সত্যি বলুন না, একজন দেখা পায়, আর একজন কেন পায় না?"

"পায় না তাঁর কারণ সকলেরই অধিকার এক রকমের নয়। দেশ-বিদেশের মহাজনগণ এই কথাই ব'লে থাকেন যে যা'র যে বিষয়ে অধিকার নাই, সে বিষয়ে সে সহসা অভিজ্ঞ হ'তে পারে না। একজন দেখ্বামাত্র যে ছবিখানি এঁকে দিতে পারেন, অনধিকারী ব্যক্তি হাজার চেষ্টা ক'রেও তা আঁক্তে সমর্থ হ'ন না। অনেকে এমন সহজাত সুরশক্তির অধিকারী যে শুন্বা-মাত্র একটী সঙ্গীত আয়ত্ত ক'রতে পারেন কিন্তু অনধিকারী সহস্র কর্ণপীড়ার সৃষ্টি ক'রেও সহজে উহা অধিকার ক'রতে পারে না।

এইরূপ সর্ব্ব বিষয়েই বলা যেতে পারে। জাগতিক বিষয় সমূহ আয়ত্ত করা যেমন আয়াস-সাধ্য তেমনি অধিকার 'সাপেক্ষ'। সেই একই কথা অতীন্দ্রিয় বিষয়েও বলা যেতে পারে। বিদেহ-আত্মা দর্শনেরও অধিকারী হওয়া চাই। সকলের সে অধিকার নাই তাই সকলে তা' দর্শন ক'রতেও পারে না, যার সে অধিকার আছে সে সহজেই দেখ্‌তে পায়। এইজন্যই সেকালের মুনি ঋষিগণ অনধিকারীকে শিষ্য ক'রতেন না। কারণ তাতে তাঁরা কাজের চেয়ে অকাজের আশঙ্কা ক'রতেন অধিক।"

আমি বলিলাম,—"আচ্ছা দাতু, এখানেও হয়ত আমাদের পাশেই কোন অশরীরী আত্মা এখনও উপস্থিত আছেন, আমাদের কথোপকথন শুন্‌ছেন অথচ আমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না, এমনও তো হ'তে পারে।"

"তা খুব পারে"

আমার মুখ হইতে আমার অজ্ঞাতসারেই বাহির হইল,—"ওরে বাবা!"

মাতামহ সাহস প্রদান করিয়া বলিলেন,—"তা'তে কি হ'য়েছে? আগেই তো ব'লেছি, তাঁ'রা কারও অনিষ্ট করেন না, তবে আর ভয় কি? আর অত সামান্যেই ভয় পেলে সংসারে তুই চল্‌বি কি ক'রে? সত্যকথা ব'ল্‌তে গেলে, মানুষের ভয়ের পাত্র একমাত্র মানুষ। ভূত প্রেত ন'ন। মানুষ মানুষের যত অনিষ্ট ক'রতে পারে তা'র শতাংশের একাংশ অনিষ্ট ক'রবার ক্ষমতাও বোধকরি আর কা'রও নেই। দৈত্য

দানব যদি সত্যই থাক্‌তেন তবে তাঁ'দেরও সে ক্ষমতা থাক্‌তো কিনা সন্দেহ।"

অতিশয় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মানুষ মানুষের এত বড় শক্র কেন হয় দাদু? একজন নিশ্চয় অপরের খুব অন্যায় করে, তাই বোধহয় অপরে শক্রতা করে। কেউ কা'রও অন্যায় না ক'রলেই তো হয়।"

মাতামহ বলিলেন,—"মানুষ যে সব সময়ে কারণেই শক্রতা সাধন ক'রে থাকে, তা নয়, অকারণেও ক'রে থাকে। দোষ ক'রেই যে মানুষ সব সময় সাজা পায় তা' নয়—বিনা দোষেও পায়। তুই কি মনে করিস্ দুষ্ট ব্যক্তিই কেবলমাত্র জগতে সাজা পায় আর সাধু নির্য্যাতিত হ'ন না। তা' যদি হ'বে তবে যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ হ'তেন না, যুধিষ্ঠির বনে বনে ফিরতেন না, রামকেও জটা বল্কল ধারণ ক'রতে হ'ত না, সক্রেটিস্‌কে 'হেমলকে'র সুরুয়া খেয়ে প্রাণত্যাগ ক'রতে হ'ত না, জগাই মাধাইয়ের হাতে মহাপুরুষ নিমাইয়েরও রক্তপাত হ'ত না। আর কত ব'ল্‌বো?"

আর বলিবার আবশ্যক নাই, দুঃখে বক্ষ কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কণ্ঠ হইতে খেদসূচকস্বরে বহির্গত হইল,—"ভগবান কেন এত জগাই মাধাই সৃষ্টি করেন দাদু!"

দাদু বলিলেন,—"তিনি কি শুধু জগাই মাধাই-ই সৃষ্টি করেন রে গাধা! জগাই মাধাইকে উদ্ধার ক'রবার জন্য শ্রীচৈতন্যও তো জন্মগ্রহণ করেন। অন্যায়ের প্রতিকার অন্যায়ের

দ্বারা হয় না, উদারতার দ্বারাই হ'য়ে থাকে। মহাপ্রভু যেমন ক'রে জগাই মাধাইয়ের হৃদয় জয় ক'রেছিলেন তেমনি ক'রেই পরম শত্রুরও হৃদয় জয় ক'রতে হয়। সেরূপ করা যদিও কঠিন কাজ, তবুও ভগবানে অচলা ভক্তি বিশ্বাস থাক্‌লে অতি বড় কঠিন কাজও সহজ হ'য়ে আসে। এই কথাটা আপদে বিপদে কখনই যেন ভুলিস্ নি ভাই!" এই বলিয়া তিনি আমার মস্তকের উপর হস্তার্পণ করিলেন। বোধহয় মনে মনে কি আশীর্ব্বাদ করিলেন।

পরে বলিলেন,—"বুড়োর বাজে বকুনী বোধহয় তোর আর ভাল লাগ্‌ছে না,—কেমন? আচ্ছা এখন তবে একটু বেড়িয়ে আয়।"

মাতামহের পদধূলি গ্রহণ করিয়া আমি সহাস্যে বলিলাম,—"না দাদু, সত্যি বল্‌ছি আপনার কথাগুলি আমার ভারি ভাল লাগ্‌ল। ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে গেলে চ'ল্‌বে না। এবিষয়ে আরও অনেক কথা আমাকে ব'ল্‌তে হ'বে কিন্তু। নতুবা শুন্‌ছি নি।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, সে হ'বে। এখন তো একটুখানি বেড়িয়ে আয় তারপর প'ড়তে ব'স্‌তে হ'বে। সে কথাটা ভুল্‌লে কিন্তু চ'ল্‌বে না।"

আমি হাসিয়া আর একবার দাদামহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া, জামাটা গায়ে চড়াইয়া এবং জুতাটা পরিয়া লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। যাইবার সময় একবার পশ্চাৎ

ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিলাম,—দাদামহাশয় আমার দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন।

মনে হইল তাঁহার সেই স্নেহ-কোমলদৃষ্টি আমার সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন সমস্ত আপদ বালাই নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া লইল।

জ

কয়েক বৎসর কালসমুদ্রে মিশিয়া গিয়াছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা কিছু না ঘটিলেও সামান্য কিছু ঘটিয়াছে। আমি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় একটু ভাল ভাবেই অর্থাৎ জলপানি লইয়াই উত্তীর্ণ হইয়াছি। স্নেহময় পিতামহ ও মাতামহের নিকট ইহা নাকি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমি এখনও কলিকাতায় মাতামহের নিকট থাকিয়াই কলেজে পড়িতেছি।

দেশে সুমন্ত্র একটি মনোহারী দোকান খুলিয়াছে। কদম ঠাকুর গড়াইতেছে। হাঁদা জমিদারী সরকারে কি একটা ক্ষুদ্র কাজ করিতেছে। লেখাপড়ার বালাই প্রায় সকলেই ছাড়িয়া দিয়াছে এবং বাবার পূজা অনেকে বড় তামাকেই সমাধা করিতে শিখিয়াছে।

দাদামহাশয় এই কয়েক বৎসরে একটু বেশী মাত্রায় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। এখন প্রায়ই তাঁহার দর্শন পাওয়া ভার। তিনি তাঁহার পূজার ঘরেই প্রায় সব সময় কাটান। মাঝে মাঝে তাঁহার প্রতি এমন অভিমানই হয় যে কি আর বলিব! বুড়ার অভাবে বাধ্য হইয়াই অবশেষে ছোঁড়ার সঙ্গেই বন্ধুত্ব করিতে হইতেছে।

আজকাল আঙ্গুলে গোনা যে দুইচারিজন সহপাঠীর সহিত মিত্রতা হইয়াছে তাহাদিগের মধ্যে সুহৃদই সর্ব্বপ্রধান।

তাঁহার বুড়া দাদামহাশয় জীবিত নাই। কিন্তু তাঁহাকে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে নামাইয়া আনিবার জন্য সুহৃদের সে কি অক্লান্ত চেষ্টা !

কখনও সে 'প্ল্যানচেটে'র সাধারণ সংস্করণ 'তেপায়া' লইয়া বসে, কখনও বা 'সারকল' করিয়া তাহার দাদুকে ধরিতে চেষ্টা করে। এইরূপ এক আয়োজনে আমাকে তাহার প্রয়োজন হয় এবং সেই প্রয়োজনের পরিণামে আমাদিগের উভয়ের ভিতর মিত্রতা সবিশেষ প্রগাঢ় হইয়া দাঁড়ায় !

অশরীরীআত্মা কি করিয়া 'তেপায়া'য় বা 'সারকেলে' নামিয়া আসেন সে বিষয়ে যাহাদিগের অভিজ্ঞতা নাই তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য এই স্থানে কিছু বলা প্রয়োজন।

তিনপদ বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র টুলের তিন ধারে তিন ব্যক্তি উপবেশন করিয়া সেই 'তেপায়া'র উপর একজনের দক্ষিণ হস্ত যথাক্রমে অপরের বামহস্তের উপর স্থাপন করিয়া শুদ্ধ চিত্তে কোন অশরীরী আত্মার বিষয় চিন্তা করিতে হয়। এমনি ভাবে চিন্তা করিতে করিতে এক সময় বিদেহ-আত্মা আসিয়া সেই 'তেপায়ার' উপর নাকি ভর করেন। তখন তাঁহাকে একটু বিশেষ ভাবে প্রশ্ন করিয়া উত্তর আদায় করিতে হয়, কারণ তিনি তো আর কণ্ঠের সাহায্যে উত্তর দান করেন না। তিনি 'তেপায়ার' পদের দ্বারা ঠক্ ঠক্ শব্দ করিয়া উত্তর প্রদান করেন।

প্রশ্নের ধারাটা হওয়া চাই নিম্নরূপ। তাহা হইলেই উত্তর মিলিবে। যথা :—

প্রশ্ন হইল,—"আপনি কি অমুক আসিয়াছেন? যদি তিনি হ'ন তো 'তেপায়ার' একটি পা তুলিয়া তিনবার ঠুকিয়া দিন।"

শব্দ হইল,—"ঠক্! ঠক্! ঠক্!"

যাহার কথা বলা হইল বুঝিতে হইবে তিনিই আসিয়াছেন। আর তিনি যদি না আসিয়া থাকেন তবে 'তেপায়া' কোন শব্দই করিবে না। যাহা হউক এইরূপ ভাবেই 'তেপায়ার' নিকট হইতে উত্তর আদায় করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই।

কিন্তু 'তেপায়ার' ঠক্‌ঠকানিকে মুক্ত আত্মার কার্য্য বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করিতে নারাজ। তাঁহারা বলেন যে উহা 'তেপায়া' ধারকদিগের দেহস্থ বৈদ্যুতিক শক্তির সহিত তাঁহাদিগের মনের সম্মিলিত ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছু নহে। হইতে পারে। কিন্তু 'সার্কল'? তাহা কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর ব্যাপার হইলেও উহা প্রেতাত্মার কার্য্য বলিয়া আমার মন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয় না।

একবার এক ছুটির দিনে সুহৃদদের বাড়ীতে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া 'সার্কল' করিয়াছিলাম।

একটি কক্ষ বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া গঙ্গাজল ছিটাইয়া ধূপ-ধুনা জ্বালাইয়া সুপবিত্র করিয়া লওয়া হইল। আমরাও প্রত্যেকে পট্টবস্ত্র পরিধান ও গঙ্গাজল স্পর্শ করিলাম।
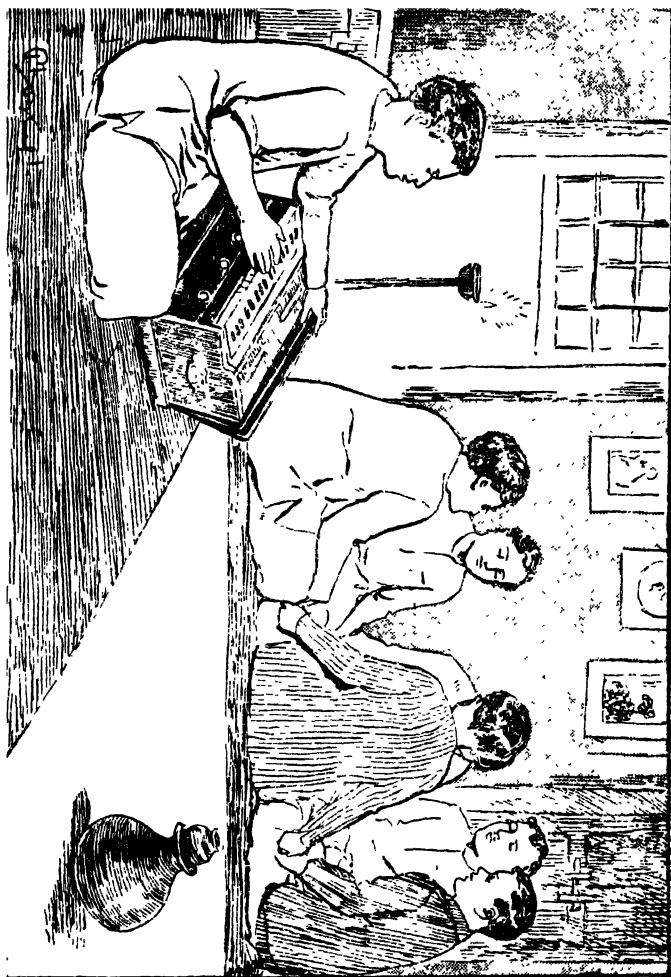
এইরূপে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। সুকণ্ঠ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া একই গান যে কতবার গাহিল তাহার সংখ্যা নাই। (৭২ পৃঃ)

সময় তখন দিবস হইলেও মৃদু ঘৃতদীপ জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। কক্ষস্থিত দরোজা জানালাগুলি বন্ধ করিয়া আমরা সকলে পরস্পর পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া গোল (circle) হইয়া উপবেশন করিলাম। সুকণ্ঠ কেবল সামান্য দূরে বসিয়া একটি হার্ম্মোনিয়ম সহযোগে শ্যামাবিষয়ক গান অনুচ্চ কণ্ঠে গাহিতে লাগিল। সকলেই আমরা পবিত্রচিত্তে আমাদের সকলেরই পরিচিত একজন পরলোকগত আত্মার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম।

এইরূপে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। সুকণ্ঠ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া একই গান যে কতবার গাহিল তাহার সংখ্যা নাই। আমি তো হতাশই হইয়াছিলাম,—নাঃ! আমাদের 'সার্কলে' কোন আত্মা কাহারও উপর আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে ধন্য করিলেন না! এমন সময় সহসা দেখি বিভাসের হাত কাঁপিতেছে। আমরা আশান্বিত হইয়া চিন্তার 'ভেলসিটি' আরও অনেকখানি বাড়াইয়া দিলাম।

বিভাসের কম্পনও ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া বাড়িয়া এখন সে একেবারে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। সে সহসা মুখে একপ্রকার অব্যক্ত শব্দ করিতে করিতে শুইয়া পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। তাহারপর ঘরময় গড়াগড়ি করিতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া ভয়ে আমার চক্ষু ছানাবড়া হইয়া উঠিল। আমি ভাবিলাম,—লোকটি মরিয়া যাইবে না কি? এমন সময়

সুহৃদ বলিল,—"ভয় নাই! প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয়েছে। তবে প্রেতাত্মাটি একটু দুষ্ট প্রকৃতির এই যা।"

আমি ব্যগ্রতা সহকারে বলিলাম,—"দুষ্ট হোক, সাধু হোক, প্রেতাত্মাকে বিদায় ক'রে লোকটিকে প্রকৃতিস্থ কর ভাই, আমার কেমন ভাল বোধ হচ্ছে না।"

সুহৃদ বলিল,—"তুই তো বড় 'নার্ভাস্' পালু, একটুতেই ঘাব্‌ড়ে যাস্! হয়েছে কি যে অমন ক'রছিস?

নধরবাবু বলিলেন,—"প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয়েছে না হাতী! ওটা শয়তানী ক'রে অমন ক'রছে।"

আমি ভাবিলাম,—"শয়তানী ক'রে মানুষ অমন ক'রতে পারে? কি জানি!"

অতঃপর আমার প্রতিবাদ সত্ত্বেও শয়তানের অঙ্গে এত বড় একটা সূচ ফুটাইয়া এফোঁড় ওফোঁড় করিয়া দেওয়া হইল কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শয়তান সেজন্য এতটুকু কাতরোক্তি করিল না। প্রেতাত্মার আবির্ভাব সম্বন্ধে অতএব আর কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবশিষ্ট রহিল না।

আমি কিন্তু প্রেতাত্মার কার্য্যকলাপ দেখিয়া ভয়ে আড়ষ্টপ্রায় হইয়া রহিলাম এবং কখন তিনি বেচারী বিভাসকে পরিত্যাগ করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

বিভাস কখনও গর্জ্জন করিতেছে, কখনও হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, আবার কখনও বা গান গাহিতেছে।

প্রেতাত্মাকে জিজ্ঞাসা করা হইল,—"আপনি কে? কেন অমন ক'রছেন?"

উত্তর শ্রুত হইল,—"আমি ডঙ্কারাম চাঁড়াল! আমার সঙ্গে চালাকি! আমাকে ফাঁকি! তেঁতুলগাছে তুলে টুঁটি টিপে দোব এক আছাড়। হাড় এক জায়গায় মাস আর জায়গায় ক'রে চামড়া নিয়ে ডুগ্‌ডুগি বাজা'ব! তবে আমার নাম—ডঙ্কারাম!"

বলা হইল,—"সে যা' হয় ক'রো বাপু, এখন গোটাকতক কথার উত্তর দাও দেখি—"

"দিবনি, দিবনি, দিবনি। উত্তর দাও! কেন আমি কি কা'রও বাপের নোকর যে কথায় কথায় 'আজ্ঞে' ব'লে উত্তর দিব? দিবনি, দিবনি, দিবনি,।"—এই বলিয়া সে ধেই ধেই করিয়া নৃত্য জুড়িয়া দিল।

তাহার পর নানা প্রশ্ন নানা কায়দায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল কিন্তু সে ওই এক বুলিই ধরিয়া রহিল,—দিবনি, দিবনি, কিছুতেই উত্তর দিবনি।"

নধরবাবু বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"চাঁড়ালের ভূত কিনা তাই এত বেয়াড়া।"

সুহৃদ বলিল,—কিছুতেই যখন ব'ল্‌বে না বাপু, তখন তুমি আস্‌তে পার।"

ভূত ভেংচি কাটিয়া বলিল,—"যেতে বলা হচ্ছে অথচ বল্‌ছে, 'তুমি আস্‌তে পার।' সোজা ক'রে কি তোমরা কোন কথা ব'লতে জান না? আমি যা'ব নি, যা'ব নি, যা'ব নি।"

নধরবাবু রসিকতা করিলেন,—“কি বাবা ভূতের পো, ‘দিবনি, দিবনি’ ছেড়ে এযে আবার নূতন ধুয়ো ধ’রলে—যা’ব নি যা’ব নি, তা’র মানে কি ?”

সুহৃদ বলিল,—“আচ্ছা যেওনি, দেখি কতক্ষণ তোমার দৌড় !”

নধরবাবু বলিলেন,—“অগত্যা !”

যেইমাত্র ‘অগত্যা’ বলা আর যাইবে কোথায় ? ভূত মহাশয় চটিয়া চতুর্ভুজ হইলেন।

“কি-ই-ঈ অগত্যা ? এত বড় ‘আস্পদ্দা’ !—দাঁত বাহির করিয়া সে যেন কামড়াইতে আসিল ।

নধরবাবু বলিলেন,—কি “বাপু’ ‘অগত্যা’ বলায় অত চ’ট্‌লে কেন ?”

ভূত বলিলেন,—“কি চ’ট্‌বো নি ? চাঁড়ালের ভূত ব’লে কি আমরা এমনি ‘মূখ্যু’ ‘অগত্যা’ কথাটারও মানে বুঝিনি মনে করিস্ ? এখন যদি তোকে চিবিয়ে খাই তো কি হয় ?”—বলিয়াই ভূত নধরবাবুর প্রতি ধাবিত হইল।

“আয় না ! কে কা’কে খায় একবার দেখি।”—বলিয়াই নধরবাবু তাহাকে জাপটাইয়া ধরিয়া ঘুমন্ত শিশুকে মাতা যেরূপ করিয়া শয্যায় শোয়াইয়া দেয় সেইরূপভাবে তিনি তাহাকে মেঝের উপর শোয়াইয়া দিলেন। নাঃ ! নধরবাবুর সাহস আছে দেখিতেছি।

ভূত কিন্তু শুইয়াই চীৎকার করিতে লাগিলেন,—“ওরে বাবা, এরা ভূত মারে ! ওরে বাবা, এরা ভূত মারে ! ”

নধরবাবু বলিলেন,—"মারিই তো! ভূত এতকাল মানুষকে মেরেছে, এইবার ভূতকে মার্‌বার পালা এসেছে—মানুষের।"

এই সময় সুহৃদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কোথা হইতে আসিয়া হুঙ্কার দিয়া রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইলেন।

তিনি বলিলেন,—"এসব তোদের হচ্ছে কি? ভূত নামানো হয়েছে? তোরাই তো এক একটা আস্ত ভূত! তোরা আবার নামাবি কা'কে? কেবল যত সব বাজে শয়তানী! ওসব বাঁদরামী ছেড়ে দে!"

তিনি তো ছাড়িতে বলিলেন কিন্তু কম্বল যে ছাড়িতে চায় না। সে যে কেবলই বলে,—"যা'ব নি, যা'ব নি যা'ব নি।" তা'র কি করা যায়!

অবশেষে কম্বলের নাকে হলুদ পোড়াইয়া ধোঁয়া দিয়া, মাথায় ঘড়া ঘড়া জল ঢালিয়া, আরও কত কি করিয়া তাহাকে ঠাণ্ডা করা হইল।

অতঃপর অনেকক্ষণ স্থির হইয়া পড়িয়া রহিয়া যেন ঘুম হইতে সে জাগিয়া উঠিল। আমি তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিবার উপক্রম করিতেছি এমন সময় বিভাসের পিতা,— তাঁহাদিগের বাড়ী তো অধিক দূর নহে—কি করিয়া সংবাদ পাইয়া মারমূর্ত্তি ধরিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। 'ন ভূত ন ভবিষ্যতি' রকমের মহা প্রচণ্ড গালাগালি দিয়া তিনি আমাদিগের ভূত ছাড়াইয়া দিলেন।

বিভাসের স্কন্ধ ত্যাগ করিলেও ডঙ্কারামভূত বোধহয় আশে পাশে নিকটেই কোনস্থানে অবস্থান করিতেছিল। সেই ডঙ্কা-

রামও বিভাসের পিতার ভৎসনার শঙ্কায় নিশ্চয়ই সেস্থান তৎ-ক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়াছিল। সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না। সে যাহা হউক গালাগালি গলাধঃকরণ করিয়া মুখ চূণ করিয়া আমরা যে যাহার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

ঝ

বাসায় ফিরিয়া আমার পাঠ-কক্ষে চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া সেই ডঙ্কারামের কথাই ভাবিতেছি। ব্যাপারটা কি? বিভাসের শয়তানী কিংবা সত্য সত্যই প্রেতাত্মার কাণ্ড? কোন যুক্তিই মনে ধরিতেছে না; কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। শুধুই চিন্তাসাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছি।

কি সৌভাগ্য! সহসা পশ্চাতে দাদুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম,—"কি ভায়া, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের মত বিরাট একটা কিছু আবিষ্কারের চেষ্টায় নিযুক্ত নাকি? নতুবা জলজ্যান্ত বুড়োটা এতক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে র'য়েছে, একটু খেয়ালও নেই যে! মানে কি?"

আমি হাসিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিয়া বলিলাম,—"কিরূপ? নিউটন অত বড় বড় বিষয় আবিষ্কার ক'রেছিলেন ব'লে কি তাঁ'র আর কোন দিকেই খেয়াল ছিল না?"

দাদুও সহাস্যেই বলিলেন,—"তা' মন যদি বিরাট ব্যাপারে সর্ব্বদা তন্ময় হয়ে থাকে তো অনেক সময় সামান্য বিষয় তা'কে এড়িয়ে যায় বই কি? মহামতি নিউটনের সম্বন্ধেই একটা মজার গল্প আছে শুনিস্‌নি কি? নিউটন আপন কক্ষে দোর এঁটে ব'সে যখন তাঁ'র গবেষণায় তন্ময় হ'য়ে থাক্‌তেন তখন সে কক্ষে কা'রো প্রবেশাধিকার থাক্‌তো না; কিন্তু তাঁ'র একটি অতি প্রিয় বিড়ালী

ছিল। দরোজা বন্ধ থাক্‌লেও সেই প্রিয়প্রাণীটির অবাধগতি যা'তে অক্ষুণ্ণ থাকে সেজন্য নিউটন তাঁ'র কক্ষের দরোজায় একটি 'ফুকর' করিয়ে দিয়েছিলেন। এখন কালক্রমে সেই বিড়ালী কয়েকটি শাবক প্রসব ক'রলে। নিউটন ছুতোর মিস্ত্রী ডাকিয়ে তা'কে বড় ছিদ্রটির পাশে আর একটি ছোট ছিদ্র ক'রে দিতে হ'বে ব'ল্‌লেন।

হেতু ?

নতুবা ছানাগুলো কোন পথে যা'বে ? কিন্তু মূর্খ মিস্ত্রী বল্‌লে,—"কেন ? যে পথে ধাড়ী যায় সেই পথেই।"

'ওঃ! তা'ও তো বটে!'

"দেখ্‌লি তো যে অতবড় বৈজ্ঞানিক তন্ময় হ'য়েছিলেন ব'লে কিরূপ সামান্য বিষয়েও খেয়াল ক'রতে পারেন নি। তুইও আজ নিশ্চয় কোন প্রকাণ্ড গবেষণায় নিযুক্ত আছিস্ তাই এই সামান্য বৃদ্ধকে আমোলই দিস্‌নি। সে যাক্! কিন্তু ব্যাপারটা কি বল্ দেখি ?"

দাতুর সহিত নাতির সময়ে সময়ে এক আধটুকু রসালাপও চলিত তাই একটু সরস করিয়াই বলিলাম,—"ব্যাপারটা একটু 'গুরুচরণ'ই দাতু, আর তা' গুরুর চরণে নিবেদন ক'রবার জন্যেই এতক্ষণ ছট্‌ফট্ ক'রছিলুম কিন্তু আজকাল যে তাঁ'র টিকিটিও দেখ্‌বার সুযোগ পাওয়া যায় না কিনা তাই ভাব্‌ছিলুম কখন সেই সুযোগ মিল্‌বে। এমন সময় দেখি ভাগ্যের আর সীমা নেই—'মেঘ না চাইতেই জল'।"

দাদু উদাস কণ্ঠে বলিলেন,—“এখন তবু তো এক আধবার টিকিটির দেখা পাচ্ছিস্ ভাই, এর পর যে তা'ও পাবিনি। টিকিটি যে এখন ছুটি চাইছে দাদু!”

“কি যে বল দাদু! সত্যি ভাল লাগে না।” একটু থামিয়া পুনরায় বলিলাম,—“ছুটি চাইলেই ছুটি পাওয়া যায় কিনা! কথায় কথায় ছুটি দিতে গেলে আমার আফিস্ চলে কিসে?”

“তোর আফিসের জোর কম নয় তা' আমি জানি, কিন্তু আরও একটা আফিস যে আছে দাদু, সে আফিসের যে আরও কঠিন পরোয়ানা! অমান্য ক'রবার কা'রও শক্তি নেই।”

আজকাল দাদুর যেন কি হইয়াছে। তিনি এই রকম সব কথা প্রায়ই বলিয়া থাকেন। শুনিয়া আমার এমন কষ্ট হয়! কিন্তু উপায়ই বা কি?

দাদুর শরীর যেভাবে দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে তাহাতে যে তাঁহার ছুটি শীঘ্রই মঞ্জুর করিতে হইবে তাহা বেশ উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিতেছি। এই সব কথা ভাবিয়া মনটা অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া উঠিতেছে, তাই দাদুকে যাহা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াছিলাম তাহা আর জিজ্ঞাসা করা হইয়া উঠিল না। এমন সময় ভৃত্য আসিয়া একখানি ডাকের চিঠি দিয়া গেল। পিতামহ মহাশয় দেশ হইতে চিঠিখানি লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

পরম স্নেহভাজন দাদুজীবন নিরাপৎসু—

ভায়া, কিছুদিন যাবৎ তোমার পত্রাদি প্রাপ্ত না হইয়া

সবিশেষ চিন্তিত আছি। আগামীতে তোমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল প্রদান করিয়া সুখী ও নিশ্চিন্ত করিবা। ইদানীং আমার শরীর গতিক 'সাতিশয়' উত্তম চলিতেছে না। দেহ ও মন প্রতিদিন ভগ্ন হইয়া পড়িতেছে। পরিণামের ভরসা চিন্তামণি। তাঁহার মনে যাহা আছে তাহাই হইবে। কিছুদিন যাবৎ তোমার সন্দর্শন লাভের নিমিত্ত হৃদয় উতলা হইয়া উঠিয়াছে। এ সময় তোমাকে একবার নিকটে প্রাপ্ত হইলে হৃদয় 'সাতিশয়' তৃপ্তিলাভ করিত। এই পত্রিকা তোমার মাতামহ মহাশয়কে প্রদর্শন করিও এবং তাঁহাকে আমার বিনয় সম্ভাষণ জানাইয়া অগৌণে একবার এখানে আসিবার চেষ্টা পাইবে। তুমি আমার শত-কোটী আশীর্ব্বাদ জানিবে। শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত অধিক লিখিতে অপারগ হইতেছি।

পরিশেষে একটি দারুণ দুঃসংবাদ প্রদানান্তর পত্রিকা সমাপ্ত করিতে যাইতেছি।

সেই লক্ষ্মীর প্রতিমা স্বরূপিনী শান্ত মেয়ে রিণী আর ইহ-জগতে নাই, সে শান্তিধামে গমন করিয়া দয়াময়ের শ্রীচরণকমলে স্থান প্রাপ্ত হইয়া শান্তিলাভ করিয়াছে। নিদারুণ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই রিণী এই ধরণীর নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। সমস্তই লীলাময়ের লীলা! দুঃখ করিও না, দুঃখ করিয়া কোন লাভ নাই। ইতি

নিত্যাশীর্ব্বাদক—

তোমার পিতামহ

পিতামহের লিখিত পত্র পাঠ শেষ হইলে উহা মাতামহের হস্তে প্রদান করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, দুঃখ করিয়া যে কোন লাভ নাই তাহা জানি, কিন্তু দুঃখ না করিয়াও যে উপায় নাই। এই এত বড় বিরাট পৃথিবীতে এতটুকু একটি মেয়েরই দু'দণ্ড স্থান হইল না! যদি তাহাকে স্থান নাই-ই দিবে, তবে হে স্থান দিবার মালিক, তাহাকে কেনই বা পাঠাইয়াছিলে? আমরা অজ্ঞান, আমরা নির্ব্বোধ, তোমার আচরণের গূঢ় রহস্য আমরা ভেদ করিতে পারি না। এই অজ্ঞানদিগকে লইয়া তোমার প্রাণঘাতী লীলা দয়া করিয়া না হয় নাই করিলে দয়াময়! যাহাদিগকে নাকি তুমি বড় ভালবাস তাহাদিগকেই তো তুমি শীঘ্র শীঘ্র কোলে টানিয়া লও শুনি। তোমার স্বপক্ষে ওকালতি তো অনেক শুনিয়াছি, শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া ভক্তিতে গদগদ হইয়া উঠিয়াছি। সেই সব যুক্তি তো মনে করিতে চেষ্টা করিতেছি তথাপি কৈ সান্ত্বনা তো পাইতেছি না। বুকের ভিতর একটা বিপুল অভিমান পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়া কেবলি নালিশ করিতে চাহিতেছে,—"হে খাম্‌খেয়ালী ঠাকুর, সময়ে সময়ে তোমার অত্যাচারের কাছে জগতের অতি বড় অত্যাচারীর অত্যাচারও যে নিষ্প্রভই হ'য়ে যায়। তুমি—"

অভিযোগটি নির্ব্বাক চিন্তাধারার মধ্যেই নিবদ্ধ না থাকিয়া স্ফুট কণ্ঠেই বহির্গত হইয়াছিল তাই দাদু সস্নেহ-ভৎ'সনা করিয়া বলিলেন,—"একটুতেই অত আত্মহারা হ'য়ে অতি সাধারণের মতই ভগবানের প্রতি কেন যে অনুযোগ কর ভাই, বুঝি না।

তিনি নির্ম্মমও ন'ন বা অত্যাচারীও ন'ন। তিনি সত্যই দয়াময়। তাঁর দয়ার কি সীমা আছে? তাঁ'র দয়া ভিন্ন মানুষ কি এক দণ্ডও বাঁচ্‌তে পার্‌তো। এবিষয়ে তোমাকে কতদিন কত উপদেশই তো দিয়েছি তথাপি তোমার কেন যে ভ্রম ঘোঁচে না বুঝি না।"

দাদুর স্বরে অসন্তোষের আভাস দেখা দিয়াছে। তিনি ভগবানের বিরুদ্ধে কোন কথাই কখন সহ্য করিতে পারেন না, তাহা জানি, তাই অতিশয় নম্র কণ্ঠে বলিলাম,—"তোমাকে ব্যথা দিয়েছি দাদু, সেজন্যে আমাকে ক্ষমা কর। ভগবানের প্রতি অনুযোগ প্রকাশ ক'রে আমি নিতান্ত অন্যায় ক'রেছি, তিনিও আমাকে ক্ষমা করুন। কিন্তু ঠাকুর্দ্দা-মহাশয়ের চিঠি পেয়ে আমি সত্যই অতিশয় বিচলিত হয়েছি দাদামশাই! তিনি তো এমন ক'রে অন্ততঃ তাঁ'র নিজের সম্বন্ধে কখনও লেখেন না দাদু, নিশ্চয়ই তাঁ'র কোন কঠিন পীড়া হয়েছে সেই কথা মনে ক'রে, আর যে আমি ধৈর্য্য ধারণ ক'রতে পারছি না। তা'র কি ক'রবো? সামান্য কিছু হলে তিনি কখনই আমাকে জানিয়ে ব্যস্ত ক'রতেন না। তাঁ'কে তো আমি ভাল ক'রেই জানি। নিশ্চয়ই তাঁ'র সাংঘাতিক কিছু হ'য়েছে। তিনি যদি না বাঁচেন! সেখানে যা'বার আগেই যদি তিনি এ হতভাগার মায়া কেটে ফাঁকি দিয়ে চ'লে যান দাদু, তা হ'লে কি হ'বে? আমি যে আর ভাব্‌তেও পারছি নি।"

মাতামহ আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন।

ভগবানের বিরুদ্ধে কোন কথা যেমন তিনি সহ্য করিতে পারি-তেন না, তেমনি আমার দুঃখও তাঁহার নিকট অসহ্য !

তিনি বলিলেন,—"তোমাকে আর অধিকক্ষণ ভাব্‌তে হ'বে না। আমি তোমার পিতামহের সঠিক সংবাদ শীঘ্রই এনে দিচ্ছি। আমি ঠাকুর ঘরে যাচ্ছি, যতক্ষণ সে ঘরে থাক্‌বো কেউ যেন না সেখানে ঢুক্‌তে পায় সে বিষয়ে দৃষ্টি রেখো।" ইহা বলিয়াই তিনি অবিলম্বে প্রস্থান করিলেন।

তাঁহার ঠাকুর ঘরে কেহই প্রবেশ করে না, করিবেও না ; সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। সুতরাং আমি বসিয়া বসিয়া দুই দাতুর সম্বন্ধে আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। এতক্ষণে পিতামহের কি হইয়াছে কে জানে ? তিনি কি মহাপ্রস্থানের পথে অগ্রসর হইয়াছেন ?

আচ্ছা, মাতামহ কি করিয়া ঠাকুর ঘর হইতে পিতামহের সংবাদ আনিয়া দিবেন ! তাহা কি করিয়া সম্ভব হইবে ? কিন্তু দাদামহাশয়কে তো কখন বৃথা বাক্যব্যয় করিতে দেখি নাই। তাঁহার প্রতি আমার অচলা ভক্তি। আমি জানি তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা করিবেনই ; কিন্তু যেন বড়ই বিলম্ব হইতেছে। এক মুহূর্ত্ত তখন আমার কাছে এক যুগ। আর অপেক্ষা না করিয়া দেশে রওনা হইলেই তো হয়। দেওয়ালে বিলম্বিত ঘড়িটির দিকে চাহিলাম। আর আধঘণ্টা পরেই একখানি ট্রেন আছে। এই খানি 'মিস্' করিলে শীঘ্রই আর কোন ট্রেন তো নাই। শেষ রাত্রে একখানা আছে, না অত

বিলম্ব আমার সহ্য হইবে না। দাদামহাশয়ের অনুমতির জন্য আমি উঠিয়া ঠাকুর ঘরের অভিমুখে গমন করিলাম।

এঙ

মাতামহের পূজার ঘর ত্রিতলে। তেতালার সিঁড়ির পার্শ্বেই একখানি মাত্র ঘর। ঘরের দেওয়ালে নানা দেব দেবীর ছবি বিলম্বিত। একধারে প্রকাণ্ড একখানি কাষ্ঠ নির্ম্মিত সিংহাসন সেই সিংহাসনের উপর মৃত্তিকা নির্ম্মিত রাধাকৃষ্ণ, শিবদুর্গা, লক্ষ্মীসরস্বতী, গোপালগণপতি, শিবকালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি কত অপরূপ মূর্ত্তি কি সুন্দর ভাবেই না সজ্জিত রহিয়াছে! মূর্ত্তিগুলি তিনি কৃষ্ণনগর হইতে কারিগর আনাইয়া বাড়ীতেই প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছেন। কারিগরের বাহাদুরী আছে। দেখিয়া মনে হয় মূর্ত্তিগুলি যেন জীবন্ত।

সিংহাসনের সম্মুখে ধূপদানি, পঞ্চপ্রদীপ, শঙ্খ, ঘণ্টা কোশাকুশি প্রভৃতি আরও কত কি রহিয়াছে। ঘরের অপর প্রান্তে একটা ক্ষুদ্র আলমারী, তাহাতে নানাবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ও দাদুর অন্যান্য প্রিয় পুস্তক রহিয়াছে। মধ্যস্থলে কয়েকখানি ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও অজিনাসন বিস্তৃতই থাকে। ঘরের সম্মুখে ছাদে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড টবে মোটামুটি পরিচিত সর্ব্বপ্রকার পুষ্প বৃক্ষই রোপণ করা হইয়াছে। ঐ সমস্ত বৃক্ষে প্রভাতে ও বৈকালে উপযুক্ত পরিমাণে জলসেচনের ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছেন। ঠাকুরঘরের সম্মুখভাগ সত্যই অতিশয় মনোরম হইয়া উঠিয়াছে।

আমি সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া দাদুর ঘরের

সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। ঠাকুর ঘরের দরোজা বন্ধ! দরোজায় কান পাতিয়া রহিলাম। কোন সাড়া শব্দ পাইলাম না। কি করিব? দাদুকে ডাকিব কিনা ভাবিতেছি। পূজার ঘরে থাকিবার সময় কেহ তাঁহাকে বিরক্ত করিলে, তিনি নিতান্ত অপ্রসন্ন হ'ন দেখিয়াছি; বিশেষতঃ ইতঃপূর্ব্বে সেই বিষয়ে আমাকে সাবধানই করিয়া দিয়াছেন। এদিকে আমার এখনই রওনা হওয়া আবশ্যক নতুবা ট্রেন ধরিতে পারিব না। কি করিব? দাদুকে না বলিয়াই কি চলিয়া যাইব? নামিবার নিমিত্ত সিঁড়িতে পদার্পণ করিয়াছি, দেখিলাম পূজার ঘরের যে জানালাটা সিঁড়ির দিকে রহিয়াছে তাহা বন্ধ নহে ঈষন্মুক্ত। সেই জানালার নিকট সরিয়া আসিয়া উহা আরও একটু খুলিয়া গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। দেখিলাম,—দাদু মৃতের ন্যায় অজিন শয্যায় শুইয়া আছেন। বিশেষ লক্ষ্য করিয়াও তাঁহার দেহে কোনরূপ স্পন্দন অনুভব করিতে পারিলাম না। দিদিমার মৃত্যু আমি দেখিয়াছি। মরিবার সময় তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, মনে হইল মাতামহকেও সেইরূপই দেখিতেছি। কি আশ্চর্য্য! এই মানবের জীবন! কিছু পূর্ব্বেও কেমন আমার সহিত কথা কহিলেন!—আর এখন? কোথায় শূন্যে মিলাইয়া গেলেন?

হঠাৎ এক অব্যক্ত বেদনায় আমার শরীর ও মন সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অকস্মাৎ উচ্চ চীৎকার করিয়া আমি সিঁড়ির ধাপের উপর বসিয়া পড়িলাম।

দেখিলাম,—দাদু মৃতের ন্যায় অজিন শয্যায় শুইয়া আছেন।

(৮৭ পৃঃ)

আমার চীৎকার শুনিয়া বাড়ীর সকলে আমাকে চীৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি কাঁদিয়া বলিলাম,—"দাদামশাই নেই, জন্মের মত ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেছেন।" সকলেই বিস্মিত হইয়া এ উহার মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম,—"দরোজা বন্ধ, জানালা দিয়ে দেখুন!" তখন সকলে ছুটিয়া সিঁড়ির জানালার নিকট গমন করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে আমার মতই অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

অতঃপর এইরূপ অবস্থায় যাহা হইয়া থাকে অর্থাৎ চেঁচামিচি কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। ডাক্তার বাড়ী লোক পাঠানো হইল। পূজার ঘরের দরোজা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। নিকটে যাইয়া সকলেই ভাল করিয়াই বুঝিলেন যে পূজার ঘরের অধিকারীর এবারকার মত পূজা চিরতরেই সাঙ্গ হইয়াছে। ইতিমধ্যে ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া সেই মতই পোষণ করিলেন। ডাক্তারের কথায় জানিতে পারিলাম, দাদামহাশয়, হৃৎ-পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায়—আমাদিগকে অনেক পূর্ব্বেই ছাড়িয়া গিয়াছেন। সুতরাং আর কোন আশাই নাই। আবার ক্রন্দন-রোল উঠিল।

সহসা একি! দাদামহাশয়ের হৃদয়-যন্ত্র স্পন্দিত হইতেছে দেখা গেল। তাঁহার শরীরের মৃত্যু-বিবর্ণতা যেন যাতুমন্ত্রে বিদূরিত হইয়া সজীব হইয়া উঠিল। কিছু পরেই তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত হইল। বোধ হইল তাঁহার চারি পার্শ্বের এই জনতা দেখিয়া

তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু তিনি কিছু বলিলেন না। সকলে যাহা বলিতে লাগিল তাহাই মাত্র শুনিতে লাগিলেন।

ডাক্তারবাবু বলিলেন,—"এমন আশ্চর্য্য কাণ্ড আমি তো পূর্ব্বে কখনও জীবনে দেখিনি।"

উপস্থিত সকলেই তাঁহার বাক্য অনুমোদন করিয়া জানাইলেন যে তাঁহারাও দেখেন নাই।

দাদামহাশয় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন,—"অনর্থক কেন এত গোলযোগ বুঝি না। আমি এখন একা থাক্‌তে চাই। আমার জন্য কোন চিন্তা নেই। পালু, তুমি যেয়ো না।"

সকলে চলিয়া গেলে বিরক্তিপূর্ণস্বরে দাদামহাশয় বলিলেন,—"এসব কি ব্যাপার পালু, কেউ যেন আমার পূজার ঘরে প্রবেশ না করে—এবিষয়ে তোমাকে কি আমি পূর্ব্বে সাবধান ক'রে দি নি? তবে?"

আমি লজ্জিত হইয়া আগাগোড়া সবিশেষ খুলিয়া বলিয়া অবশেষে কহিলাম,—"আপনার অবস্থা দেখে আমি বড়ই অস্থির হ'য়ে পড়েছিলুম দাদু, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

দাদু যেন তথাপি প্রসন্ন হইলেন না। তিনি গম্ভীর কণ্ঠেই বলিলেন,—"সে কথা যাক্! তোমার পিতামহ সত্যসত্যই অতিশয় পীড়িত হ'য়েছেন, তোমার অবিলম্বেই সেখানে যাওয়া কর্ত্তব্য! কিন্তু এখন তো যা'বার কোন ট্রেণ নেই, তুমি প্রস্তুত থেক রাত্রেই রওনা হ'তে হ'বে। তা' ছাড়া আর উপায় কি?"

অতঃপর তিনি পিতামহের পীড়ার যথাযথ বর্ণনা করিলেন। দাদামহাশয়ের কথার ভাবে মনে হইল তিনি অতিশয় চিন্তিত হইয়াছেন। পিতামহের পীড়া তাহা হইলে নিশ্চয়ই সাংঘাতিকই হইয়াছে। দুশ্চিন্তায় আমার হাত পা যেন অবশ হইয়া আসিল। তবে কি আর ইহজীবনে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে না!

এই দারুণ দুর্ভাবনার মধ্যেও মনে একটা কৌতূহল উপস্থিত হইল এই ভাবিয়া যে মাতামহ কি করিয়া আমার পিতামহের পীড়ার এই কঠিন অবস্থার কথা অবগত হইলেন?

এতক্ষণে মনে পড়িল দাদামহাশয়ের নিকটে একখানি পুস্তক ছিল তাহাতে পড়িয়াছিলাম, কোন যোগীর আত্মা, দেহ হইতে বাহির হইয়া নিমিষে যদৃচ্ছা পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় আপন দেহে প্রবেশ করিতে পারিত। মাতামহও তাহাই পারেন নাকি?

কৌতূহল আর দমন করিতে না পারিয়া দাদুকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঠাকুর্দ্দা, যে অত্যন্ত পীড়িত তা বুঝতে পেরেছি দাদু কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্ছি এই ভেবে যে আপনি কি ক'রে তাঁ'র শারীরিক অবস্থার সঠিক সংবাদ তাঁ'কে না দেখেই জান্‌তে পার্‌লেন! তিনি তো চিঠিতে বিশেষ কিছুই লেখেননি, তবে কি বইতে পড়া সেই যোগীর মত আপনিও—"

দাদু কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন,—"আমি বড় শ্রান্ত পালু, বেশী কথা ব'ল্‌তে এখন আমার ভাল লাগ্‌ছে না।

এবিষয়ে যদি কখনও কাউকে কিছু বলি তো সে তোকেই ব'ল্‌বো ; তবে আজ নয়। এখন আমি একটু বিশ্রাম ক'রতে চাই। দেশে যা'বার জন্যে তুই কিন্তু প্রস্তুত থাকিস্‌! কিছু টাকা সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাস্‌, প্রয়োজন হ'তে পারে।"

"আচ্ছা" বলিয়া বাহিরে আসিলাম।

যা'ক্‌, অবশেষে দাদু প্রসন্ন হইয়াছেন। নতুবা তিনি 'তুমি' ছাড়িয়া 'তুই' বলিতেন না। রাগ হইলে দুই দাদুকেই দেখিতে পাই 'তুই' ছাড়িয়া 'তুমি' ধরেন এবং আমিও ভীত হইয়া 'তুমি' পরিত্যাগ করিয়া 'আপনি' বলি।

ট

রাস্তায় বর্ণনাতীত উদ্বেগ ভোগ করিয়া যথা সময়ে গৃহে আসিয়াছি। পথ আর কিছুতেই শেষ হইতে চাহে নাই সময়ও যেন কিছুতেই কাটিতে চাহে নাই।

ভাবিয়াছিলাম,—গৃহে উপস্থিত হইলেই উদ্বেগের শেষ হইবে। দুর্ভাবনায় অন্তর যে কতখানি ক্লিষ্ট হইতেছে তাহা তো অন্তর্য্যামী টের পাইতেছেন; তিনি কি আর মুখ তুলিয়া চাহিবেন না। নিশ্চয়ই চাহিবেন। বাড়ীতে যাইয়া নিশ্চয়ই পিতামহকে ভাল দেখিয়াই নিশ্চিন্ত হইব। কিন্তু হায় কুহকিনী আশা!

বাড়ীতে আসিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার সমস্ত স্বপ্নই নিষ্ফল হইয়া গেল। ঠাকুরদাদার বাঁচিবার আশা যে বিন্দুমাত্রও নাই তাহা আমার মত আনাড়ির পক্ষেও বুঝিতে এতটুকু কষ্ট হইল না। বৃদ্ধ যেন আমাকে দেখিবার জন্যই কোনরূপে তাঁহার প্রাণপাখীটিকে দেহের খাঁচায় জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ নিবিবার অগ্রে যেরূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠে সেইরূপ আমাকে দেখিয়া তিনি যেন বিশেষ পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

আগ্রহসহকারেই তিনি বলিলেন,—"এসেছিস্ দাদু, আয় আয়, আরও কাছে আয়! কত কথাই ব'ল্‌বার আছে, ব'ল্‌তে

হ'বে। পথশ্রমে তুই ক্লান্ত একটু জিরিয়ে নে। তা'রপর সব কথা একে একে ব'ল্‌বো বই কি। আর তুই যখন এসেছিস্ তখন আর ভাবনা কি? এখন আমি সেরে উঠ্‌বো। না, আর কোন ভাবনা নেই।"

জোর করিয়া কথাগুলি বলিয়াই তিনি একেবারে স্তব্ধ হইলেন।

নাঃ, তাঁহার আর কোন ভাবনাই নাই। তিনি ভাবনার পর্ব্বত আমার মাথার উপর চাপাইয়া দিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইলেন। আমাকে পথশ্রমে ক্লান্ত দেখিয়া বিশ্রাম করিতে আদেশ দিয়া নিজেই পরপারের পথে যাত্রা করিলেন। কে জানে সে পথে চলিতে শ্রান্তি ক্লান্তি আসে কিনা? এক মুহূর্ত্তে সব শেষ হইয়া গেল।

"দাদু! দাদু!!" চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। জীবিতাবস্থায় যিনি আমার এতটুকু দুঃখও সহ্য করিতে পারিতেন না, এখন তিনি আমার এতবড় কষ্টেও এতটুকু বিগলিত হইতেছেন না! যাঁহারা সেই সময় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সময়োচিত সান্ত্বনাবাণী শুনাইয়াছিলেন। কিন্তু বেশ মনে আছে তাহাতে একটুও সান্ত্বনা পাই নাই। বৃদ্ধের জন্য অমন করিয়া আমাকে শোকার্ত্ত হইতে দেখিয়া অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিতই হইয়াছিলেন। অনেকের নিকটই উহা বাড়াবাড়ি বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা তো জানেন না যে বৃদ্ধ আমার কি ছিলেন! যাক্—

শোকে হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেলেও কর্ত্তব্যের দাবী না মিটাইয়া তো কোন উপায়ই নাই, সুতরাং অতঃপর যাহা যাহা কর্ত্তব্য যন্ত্রচালিত পুত্তলিকাবৎ তাহা করিতেই হইল। সকলই করিলাম। যে মুখের অমিয়বাণী শ্রবণ করিয়া হৃদয় আমার একদিন আনন্দ-সাগরে সন্তরণ করিয়াছিল সেই মুখেই সেইদিন অগ্নি প্রদান করিয়াছিলাম—যাহা যাহা করিতে হয় সকলই করিলাম।

অতঃপর শ্রাদ্ধাদি কার্য্য শেষ করিতে হইবে। কি করিয়া যে কি হইবে কিছুই বুঝিতেছি না। চারিপাশের সহানুভূতি, সান্ত্বনা ও উপদেশের বিভীষিকায় আমি কণ্টকিত হইয়া উঠিলাম।

এই দুঃসংবাদের কথা ইতঃপূর্ব্বে কলিকাতায় মাতামহকে 'তার' করিয়া জানাইয়াছি। পরে পত্রেও সবিশেষ লিখিয়াছি কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহার কোনই উত্তর পাইলাম না কেন বুঝিতেছি না। জগতে যাঁহারা আমার সর্ব্বাপেক্ষা আপনার ছিলেন তাহার একজন তো আমার মায়া কাটাইয়াছেন আর একজনেরও কোন সংবাদ পাইতেছি না। এ যে কি কষ্ট তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কে বুঝিবে? মন অতিশয় বিষণ্ন! একাকী বসিয়া বসিয়া চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেছি। কি করিয়া দায়মুক্ত হইয়া পুনরায় মাতামহের স্নেহের কোলে ফিরিয়া যাইব সেই কথাই গভীর রজনীতে নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া ভাবিতেছি।

এমন সময়ে অদূরে সম্মুখে দেখি মাতামহ বসিয়া আমার

দিকে চাহিয়া আছেন। চারিদিকে বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম। কক্ষ অর্গলবদ্ধ! তবে কি করিয়া মাতামহ আমার অজ্ঞাতে বদ্ধ কক্ষে প্রবেশ করিলেন! তিনি কলিকাতা হইতে আসিলেনই বা কখন? তবে কি?—হয়ত ভীত হইবারই কথা! কিন্তু সত্য বলিতেছি কিছুমাত্র ভীত হইলাম না বরং অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। হস্তে চরণ স্পর্শের কোন অনুভূতিই প্রাপ্ত হইলাম না। মাতামহ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক নিষেধ করিয়া বলিলেন,—"থাক্! অনেক কথা আছে, ব'স।"

আমি তাঁহার চরণপ্রান্তে উপবেশন করিলাম।

তিনি বলিতে লাগিলেন,—"তোদের সংসারের ভাষায় ব'ল্‌তে হ'লে ব'ল্‌তে হয় আমি ম'রে গেছি। তা'তে ভয় পাস্‌নি যেন! এতে ভয় পা'বার তো কিছু নেই। মনে আছে তুই পরলোকগত আত্মার সাক্ষাৎ চেয়েছিলি? ম'রবার পর দেখা দিয়ে তোর সে কামনা মেটাব ব'লেছিলুম! তাই দেখা দিতে এসেছি। তোর ভয় পাচ্ছে?"

সত্যই আমার বিন্দুমাত্র ভয় হয় নাই। অতি বিস্ময়, আমার ভয় দুঃখকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। আমি বলিলাম,—"না ভয় কেন পাব দাদু, ভয় পাইনি তবে ভাব্‌ছি—একি সত্যি? স্বপ্ন দেখ্‌ছি না তো?"

দাদু বলিলেন,—"ভাল ক'রে চেয়ে দেখ! আমাকে এখনি চ'লে যেতে হ'বে। বেশীক্ষণ তো থাকতে পারবোনা, যা' জান্‌বার শীঘ্র শীঘ্র জেনে নে আমারও যা' ব'লবার তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে নি

"আমি আর কি বল্‌বো দাদু, আমি একেবারে হতবুদ্ধি হ'য়ে প'ড়েছি। ঠাকুর্দ্দা চ'লে গেলেন, তুমিও ফাঁকি দিয়েছ বুঝ্‌তেই পারছি। আমার চারিদিকে অন্ধকার! এই অন্ধকার সমুদ্র যে কি ক'রে পার হ'ব কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না। তা'র চেয়ে আমাকেও কেন তোমরা সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও না।"

দাদু বিষাদপূর্ণ-স্বরে বলিলেন,— "তা' কি হয় ভাই! কেউ কি কা'কেও এখানে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌তে পারে? সময় হ'লে প্রত্যেকে আপনি এখানে চ'লে আসে।"

আমি বলিলাম,—"কেন? অনেকে তো অসময়েও আত্ম-নাশ ক'রে এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ ক'রে চলে যায়!"

তিনি যেন শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"ছি! ছি! আত্মহত্যা তো দূরের কথা, ওকথা কল্পনা করাও মহাপাপ! যা'রা আত্মহত্যা করে তা'রা যে কি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে তা বর্ণনা ক'রে বোঝানো যায় না। এমন দুর্ম্মতি যেন কখনও কা'রও না হয়।

"কিন্তু আমি যে আর সহ্য ক'রতে পারছি না দাদু, এক সঙ্গে এতবড় সর্ব্বনাশ আর কা'র হয়েছে? এতবড় দুঃখই বা আর কে পেয়েছে? আমার মুখের দিকে চাইতে যে আর কেউ নেই দাদু!"

দাদু সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—"কেন ভগবান আছেন। দুঃখে অভিভূত না হ'য়ে দুঃখকে জয় করাই তো শক্তিমানের পরিচয়! সেই শক্তির পরিচয় তোকে দিতেই হ'বে। ব'ল্‌তে গেলে এতদিন দুঃখের কোন আঁচই তো তোর

গায়ে লাগেনি। ভবিষ্যতে হয়ত দুঃখের সাগরে তোকে নিমজ্জিত হ'তে হ'বে। কিন্তু তা'তে ভয় পেলে চ'ল্‌বে না। যত বড় বিপদই আসুক না কেন, ভগবানে বিশ্বাস রেখে সত্যপথ ধ'রে থাকিস্, সব বিপদ-আপদ সূর্য্যোদয়ে কুয়াসার ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে যা'বে।

আমি আর অধিকক্ষণ থাক্‌তে পারব না। শেষ কথা ব'লে যাই। বিপদে আত্মহারা হ'স-নি, ভেঙ্গে পড়িস্ নি, তা'কে জয় করিস্। আমি ও তোর পিতামহ পরলোক থেকে তা' দেখে খুশী হ'ব জানিস্।"

এতক্ষণে উভয় চক্ষু ছাপাইয়া বরষা নামিয়া আসিল। কিছুতেই তাহা রোধ করিতে পারিলাম না।

মাতামহ বলিলেন,—"কাঁদিস্ কেন? তোকে কাঁদ্‌তে দেখে তোর ঠাকুর্দ্দামশাইও অত্যন্ত বেদনা পাচ্ছেন, তিনিও এখানে উপস্থিত আছেন। কাঁদিস্ নি, চুপ্ কর্।"

"ঠাকুর্দ্দাও কি এসেছেন? কৈ তাঁ'কে তো দেখ্‌তে পাচ্ছি নি। এসেও তিনি এতক্ষণ আমাকে না দেখা দিয়ে র'য়েছেন? দাতু, দাতু, একবার দেখা দাও।"

পিতামহের দেখা পাইলাম না কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম,—"দেখা দেব ভাই, দেখা তুই পাবি। কিন্তু আজ নয়। আমি কোথাও যা'ব না। তোর কাছে কাছেই থাক্‌বো। আমাদের শুভেচ্ছা সর্ব্বদা তোকে ঘিরে থাক্‌বে তুই ভয় পাস্ নি! কোন বিপদই তোকে কিছু ক'র্‌তে পারবে না।"

এমন সময় মাতামহ বলিলেন,—"আর আমি অপেক্ষা ক'রতে পারি নি ভাই, আমি চল্লুম।"

"আর একটু দাঁড়াও দাদু!"

মাতামহ যাইতে যাইতে একবার মাত্র পশ্চাৎ ফিরিয়া আমার প্রতি করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়াই পুনরায় অগ্রসর হইলেন। আমি তাঁহার গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিলাম। দেওয়ালের নিকট পর্য্যন্ত যাইয়া অশরীরী মূর্ত্তি যেন ধীরে ধীরে ভিত্তি গাত্রে মিলাইয়া গেল। চক্ষু মুছিয়া চারিদিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম। অর্গলবদ্ধ নির্জ্জন কক্ষ। ঘড়িটি যেন তাহার স্বাভাবিক টিক্ টিক্ ধ্বনি চতুর্গুণ চড়াইয়া দিয়া নিস্তব্ধতার বুকে অবিশ্রান্ত হাতুড়ি পিটিতেছে। রন্ধ্রপথ দিয়া একটা স্নিগ্ধ শীতল বাতাস প্রবেশ করিতেছে। প্রদীপটি কম্পিত কলেবরে বসিয়া বসিয়া তাহার চারিপাশের আলো ছায়ার নৃত্যলীলা অবলোকন করিতেছে।

প্রাণে কি ভীতির সঞ্চার হইতেছে নাকি? না, না, তাহা হইবে কেন? এসব বিষয় তো আমার অজ্ঞাত নহে। তবে?—সংস্কার! হাঁ, সংস্কারের শিকড় এমনি দৃঢ়বদ্ধই বটে! কিন্তু আমাকে তাহার মূলচ্ছেদ করিতেই হইবে; ভয় পাইলে চলিবে না।

মাতামহ তো চলিয়া গেলেন। পিতামহকে দেখিতে পাই বা না পাই, তাঁহার কথা তো শুনিয়াছি। তিনি কি এখনও এখানে আছেন? না—চলিয়া গিয়াছেন?

"ঠাকুর্দ্দা, ঠাকুর্দ্দা, তুমি কি এখানে আছ? না চ'লে—"

"আমি এখানেই আছি ভাই, তোকে ছেড়ে আমি কোথায়ও যা'ব না। তোর সকল আপদে বিপদে আমার অদৃশ্য হস্ত তোকে রক্ষা ক'রবার জন্য সর্ব্বদার নিমিত্তই প্রসারিত থাক্‌বে জানিস্! তুই নিশ্চিন্ত থাকিস্! কোন সঙ্কটেই ভয় পাস্‌নি।"

"আচ্ছা, দাদু!"

অশরীরী-কণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—"না, না, উত্তপ্ত মস্তিষ্কে আর নয়। এখন একটু ঘুমো, অনেক রাত হ'য়েছে। আজ আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিস্ নি, উত্তর পাবি নি, তুই ঘুমো! আমি আসি।"

"ঠাকুর্দ্দা! ঠাকুর্দ্দা!!"

কোন উত্তরই আর পাইলাম না। তথাপি বক্ষে অনেকটা সাহস জাগিয়াছে। অত দুঃখেও ভাবিলাম,—'বাপ্‌রে! এঁদের দেখিতেছি, যে কথা সেই কাজ! এ সংসারের লোকের মত এঁরা মোটেই নন। তাই তো এঁদের আর এ সংসারে স্থানও হয় না।'

অতঃপর এই দুনিয়ার ভোজবাজীর কথা ভাবিতে ভাবিতে কখন এক সময় গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম কিছুই টের পাই নাই।

"বাবু! বাবু! "তার" এসেছে দোর খুলুন।"—শব্দে সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দরোজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, অনেকখানি বেলা হইয়াছে। তাড়াতাড়ি 'সহি' দিয়া পিওনের হাত হইতে 'আর্জ্জেণ্ট' টেলিগ্রামখানি লইয়া

পড়িয়া দেখিলাম উহা মাতামহের মৃত্যু সংবাদ বহন করিয়া অনিয়াছে।

বিচলিত হইবার কথা কি? এসংবাদ তো আমার অজ্ঞাত নহে। সত্যই তাহা হইলে মাতামহও ফাঁকিই দিয়াছেন। পূর্ব্ব রাত্রের ঘটনা তাহা হইলে মিথ্যা নহে। উহা উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা বা স্বপ্নও নহে। উহা তবে ধ্রুব সত্য! পিতামহও তবে তো আমার সাথে সাথেই রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিতে পাই বা না পাই তাঁহার কণ্ঠস্বর তো ইচ্ছা করিলেই শুনিতে পাইব।

ব্যাকুল কণ্ঠে তখন ডাকিলাম,— "ঠাকুর্দ্দা, ঠাকুর্দ্দা, তুমি কি এখানে আছ? উত্তর দাও দাদু, উত্তর দাও।"

কিন্তু কৈ কোন উত্তরই তো পাইলাম না। অতঃপর কতবার কতরকমে কত কাকুতি মিনতি করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়াছি কিন্তু কৈ কোন রকমেই তো তাঁহার কোন উত্তরই আর পাইলাম না।

তবে? তবে যাহা দেখিয়াছি তাহা কি স্বপ্ন-সঞ্জাত অলীক কল্পনা? কে জানে?

* * * * *

সম্মুখে সুদীর্ঘ পথ! সহায়হীন, সম্বলহীন একাকী চলিতে হইবে। উৎসাহ দিতে, সাহায্য করিতে কেহ নাই,—কেহ নাই। তবু চলিতে হইবে। বেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়িলে চলিবে না; দুঃখকে জয় করিতে হইবে। নতুবা পারের পথের পথিকগণ যে পরাজয়ে বেদনা পাইবেন।

হে এই সংসারের কণ্টকাকীর্ণ পথের পথিক, তোমাকে চলিতে হইবে। তুমি চল, থামিও না; মহাজনদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তুমি চল। তোমার সম্মুখে শান্তির তোরণদ্বার! সে তোমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। ওগো নিরাশ পথিক! হতাশ হইও না, আশায় বুক বাঁধ! তোমাকে চলিতে হইবেই—তুমি চল।